ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্রমূলক

শিক্ষাব্যবস্থা

মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

কলকাতা আলীয়া মদ্রাসা
প্রতিষ্ঠাতা: লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস
সন: ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ

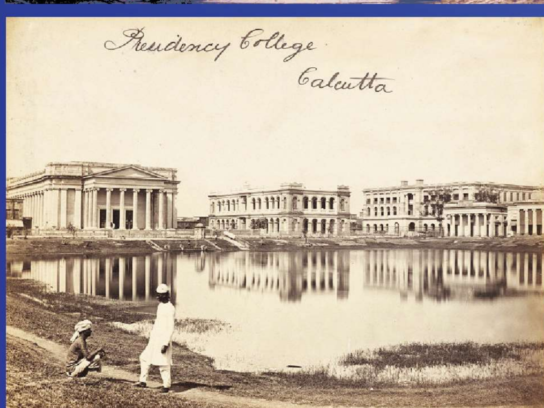

প্রেসিডেন্সি কলেজ
প্রতিষ্ঠাতা: ডেভিড হেয়ার
সন: ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দ

লর্ড মেকলে ঔপনিবেশিক শিক্ষা সম্পর্কে ১৮৩৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যে বক্তব্য দেন তার অংশবিশেষ:

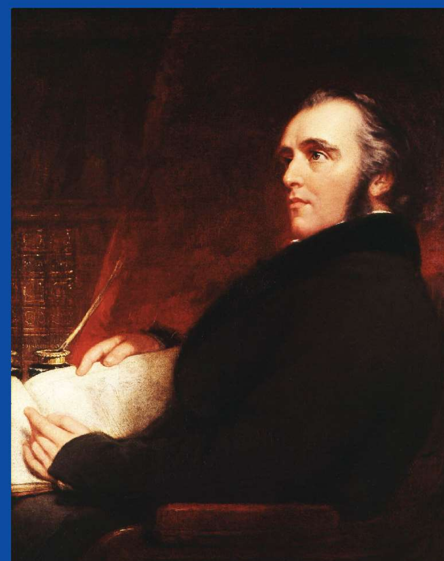

ইংরেজ রাজনীতিবিদ টমাস ব্যাবিংটন ম্যাকলে যিনি ১৮১৩ সনে ব্রিটিশ ভারতে প্রণীত ইংরেজদের সর্বপ্রথম শিক্ষানীতি প্রবর্তন করেন।

"I have travelled across the length and breadth of India and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber, that I do not think we would ever conquer this country, unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage, and, therefore, I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture and they will become what we want them, a truly dominated nation."

"আমি ভারতের এ মাথা থেকে ও মাথা ঘুরে বেড়িয়েছি কিন্তু একটি ভিক্ষুকও আমার চোখে পড়ে নি, একটি চোরও আমি দেখতে পাই নি। এ দেশে সম্পদের এত প্রাচুর্য এবং এদেশের মানুষগুলি এতটাই যোগ্যতাসম্পন্ন ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী যে এদেশকে আমরা কখনোই পদানত করতে পারবো না যদি না তাদের মেরুদণ্ডটি ভেঙ্গে ফেলতে পারি। এদেশের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যই হচ্ছে সেই মেরুদণ্ড। এ কারণে আমার প্রস্তাব হচ্ছে, আমরা এখানকার প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা, সংস্কৃতিকে এমন একটি শিক্ষা ও সংস্কৃতি দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যাতে প্রতিটি ভারতীয় নাগরিক ভাবতে শেখে যে, যা কিছু বিদেশি এবং ইংরেজদের তৈরি তা-ই ভাল এবং নিজেদের দেশের থেকে উৎকৃষ্টতর। এভাবে নিজেদের উপরে শ্রদ্ধা হারাবে, তাদের দেশজ সংস্কৃতি হারাবে এবং এমন একটি দাসজাতিতে পরিণত হবে ঠিক যেমনটি আমরা চাই।"

তওহীদ প্রকাশন
১৩৯/১ তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
www.hezbuttawheed.org
ISBN: 978-984-8912-30-0

ঔপনিবেশিক

ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষাব্যবস্থা

হেযবুত তওহীদ

মাননীয় এমামুযযামান, The Leader of The Time

জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী’র

বিভিন্ন লেখা ও বক্তব্য থেকে সম্পাদিত

ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষাব্যবস্থা

সম্পাদনা : রিয়াদুল হাসান

প্রচ্ছদ: মনিরুল ইসলাম চৌধুরী

প্রকাশনা ও পরিবেশনা:

তওহীদ প্রকাশন

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের একমাত্র পরিবেশক (২০০৯-১৪)

১৩৯/১ তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

০১৭১১-০০৫০২৫, ০১৭১১-৫৭১৫৮১, ০১৬৭০-১৭৪৬৪৩

ওয়েবসাইট: www.hezbuttawheed.org

ইমেইল: askhezbuttawheed@gmail.com

ISBN: ৯৭৮-৯৮৪-৮৯১২-৩০-০

১ম প্রকাশ : ১ আগস্ট ২০১৪

২য় মুদ্রণ: ৬ সেপ্টেম্বর ২০২১

২য় মুদ্রণ: ১০ জুলাই ২০২৪

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা মাত্র

সূচিপত্র

১। প্রাক-কথন ০৫
২। ইতিহাসের পদস্খলন ১১
৩। ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষাব্যবস্থা ১৯
৪। ব্রিটিশ শিক্ষায় শিক্ষিতদের দাস মনোবৃত্তি ২৯
৫। বেকার সমস্যা শিক্ষাব্যবস্থার ফসল ৩৯
৬। ব্রিটিশরা কী দিল কী নিল?..৪৩
৭। রাজনীতিতে শিক্ষিতদের ব্যবহার ৪৯
৮। ইহুদিবাদীদের ষড়যন্ত্রের দলিল ৫২
৯। দাসের শাসন ভয়ঙ্কর ৫৩
১০। শিক্ষিতদের দুর্নীতিতে ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থার দায়...................................৭১
১১। আমাদের অবস্থা এবং আজকের প্রয়োজন...৭৬
১২। মাননীয় এমামুয্যামানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৮২

আমাদের অন্যান্য বইসমূহ

১. ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা
২. ইসলামের প্রকৃত সালাহ্
৩. The Lost Islam
৪. যামানার এমামের পক্ষ থেকে মহাসত্যের আহ্বান
৫. দাজ্জাল? ইহুদি-খ্রিস্টান ‘সভ্যতা’! (বাংলা ও ইংরেজি)
৬. হেযবুত তওহীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
৭. জেহাদ, কেতাল ও সন্ত্রাস
৮. এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব (পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সঙ্কলন)
৯. আসুন-সিস্টেমটাকেই পাল্টাই
১০. আল্লাহর মো’জেজা: হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা
১১. বাঘ-বন-বন্দুক (শিকারের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবরণ)
১২. বিশ্বনবী মোহাম্মদ (দ:) এর ভাষণ
১৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি যামানার এমামের পত্রাবলী
১৪. ইসলাম শুধু নাম থাকবে
১৫. বর্তমানের বিকৃত সুফিবাদ
১৬. চলমান সঙ্কট নিরসনে হেযবুত তওহীদের প্রস্তাবনা
১৭. জোরপূর্বক শ্রমব্যবস্থাই দাসত্ব
১৮. দান: ইসলামের অর্থনীতির চালিকাশক্তি
১৯. ধর্মব্যবসার ফাঁদে
২০. হলি আর্টিজানের পর...

২১. সওমের উদ্দেশ্য
২২. চলমান সংকট নিরসনে আদর্শিক লড়াইয়ের অপরিহার্যতা
২৩. আক্রান্ত দেশ আক্রান্ত ইসলাম
২৪. সম্মানিত আলেমদের প্রতি
২৫. তওহীদ জান্নাতের চাবি
২৬. শোষণের হাতিয়ার (DIVIDE & RULE -শোষণের হাতিয়ার)
২৭. পাশ্চাত্যের মানসিক দাসত্ব দূরীকরণে গণমাধ্যমের করণীয়
২৮. সকল ধর্মের মর্মকথা সবার উর্ধ্বে মানবতা
২৯. পন্নী পরিবারের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস
৩০. জঙ্গিবাদ সঙ্কট: উত্তরণের একমাত্র পথ
৩১. পর্দাপ্রথার গোড়ার কথা
৩২. শ্রেণিহীন সমাজ, সাম্যবাদ ও প্রকৃত ইসলাম

প্রাক কথন

মানুষ আর দশটা প্রাণীর মত নয়। সে দেহ এবং আত্মার সমন্বয়ে উন্নত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন অসাধারণ একটি সৃষ্টি। সে একাধারে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি। তার এই শ্রেষ্ঠত্ব বা অপকৃষ্টত্ব নিরূপিত হয় তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কর্মের দ্বারা, আর এই চরিত্র নির্মাণ করে তার শিক্ষা। 'প্রাণী' মানুষকে আশরাফুল মখলুকাতে রূপান্তরিত করাই হচ্ছে শিক্ষার উদ্দেশ্য। একটি পশুর মধ্যেও শিক্ষিত-অশিক্ষিতের ব্যবধান আছে। একটি শিক্ষিত ঘোড়া প্রভুর বাধ্য অনুগত থাকে, সে যুদ্ধের মাঠে প্রভুর জীবন রক্ষা করে, প্রভুর ইশারার অনুগামী হয়, শৃঙ্খলায় ক্ষিপ্রতায় সে অ-প্রশিক্ষিত ঘোড়া থেকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা থাকে। যে শিক্ষা মানুষকে চরিত্রে, চিন্তায়, কর্মে উন্নত করে সেটাই প্রকৃত শিক্ষা, আর যে শিক্ষা মানুষকে চরিত্রে, চিন্তায় কর্মে অধঃগামী করে সেটা কুশিক্ষা। সকল সত্য ও ন্যায়ের উৎস মহান আল্লাহ। তিনিই মানুষের এবং সকল দৃশ্যমান ও অদৃশ্যের স্রষ্টা। সুতরাং মানুষের প্রথম শিক্ষাই হওয়া উচিৎ স্রষ্টা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা, সকল জ্ঞানের উৎস হচ্ছেন স্রষ্টা। সেই মহান সত্ত্বাকে বাদ দিয়ে কোন জ্ঞান হতে পারে না। আবার সৃষ্টির মধ্য দিয়েই স্রষ্টার পরিচয়, তাই সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করাও শিক্ষার মৌলিক অংশ। এই জ্ঞানকেই বলা যায় বিজ্ঞান। তৃতীয়ত, যেহেতু মানুষ সামাজিক জীব; তাই তাকে জ্ঞান লাভ করতে হবে মানবজাতির শান্তিতে বসবাসের জন্য যে জীবনব্যবস্থা আল্লাহ তাঁর নবী-রসুলদের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন, সেই জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে। এক কথায় বলতে গেলে, একজন শিক্ষিত মানুষকে সবার আগে জানতে হবে, স্রষ্টার সাথে তার কি সম্পর্ক এবং তারপর জানতে হবে মানবজাতির সঙ্গে তার কি সম্পর্ক। এরপর জানতে হবে সৃষ্টির অন্যান্য বস্তুনিচয়ের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক। এই তিনটি বিষয়ে একজন ব্যক্তির যদি সঠিক ধারণা না থাকে তবে তাকে শিক্ষিত বলা যাবে না।

মহান আল্লাহ তাঁর শেষ নবীর মাধ্যমে যে জীবনব্যবস্থা দান করেছেন সেই ব্যবস্থা মোতাবেক পরিচালিত সমাজে শিক্ষার উদ্দেশ্যই হবে মানবতার কল্যাণ। আত্মিক, চারিত্রিক ও জাগতিক জ্ঞানের সমন্বয়ে এমন শিক্ষাব্যবস্থা হবে যেখানে শিক্ষক হবেন মানবতাবাদী, মহৎ, সত্যনিষ্ঠ মহান আদর্শের প্রতীক। তিনি শিক্ষাদানকে মানবজাতির প্রতি নিজের কর্তব্য ও দায়বদ্ধতা (Duty and Responsibility) বলে এবং সকল জ্ঞানকে স্রষ্টার পক্ষ থেকে আমানত বলে মনে করবেন। শিক্ষাকে আজকের মত পণ্যে পরিণত করা হবে না, এতে থাকবে ধনী-নির্ধন সকলের

সমান অধিকার। আল্লাহর রসুল বলেছেন, ‘‘পূর্ববর্তী কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে, ‘হে আদমের সন্তান! পারিতোষিক গ্রহণ ব্যতীত শিক্ষা দান কর, যেরূপভাবে পারিতোষিক দেওয়া ছাড়া শিক্ষালাভ করিয়াছে।’ (ইবনে মাসউদ (রা:) বর্ণিত হাদীসে কুদসী)। এটা ইতিহাস যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে শিক্ষকগণ বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষাদান করতেন। পরবর্তিতে ইসলাম কিছুটা বিকৃত হয়ে গেলে শিক্ষকগণকে তাদের সাংসারিক খরচ বাবদ বায়তুল মাল থেকে ভাতা দেওয়া হতো। যেহেতু শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার, তাই ইসলামী রাষ্ট্রে শিক্ষা সার্বজনীন ও অবৈতনিক হয় (দেখুন: হাদীসে কুদসী-আল্লামা মুহাম্মদ মাদানী- ই.ফা.বা)। আল্লাহ বিনামূল্যে আদমকে (আ:) তাঁর সৃষ্টিজগতের জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন (সুরা বাকারা ৩১), সুতরাং তিনিও বনি আদমকে বিনা পারিশ্রমিকে সেই জ্ঞান অন্যকে দান করতে বলেছেন। এটাই সকল ধর্মের সনাতন শিক্ষা কেননা রসলাল্লাহ বলেছেন এটা ‘পূর্ববর্তী কেতাবে লিপিবদ্ধ আছে।’ তাই প্রকৃত ইসলামের শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষকে শিক্ষার্জন করতে গিয়ে কাড়ি কাড়ি অর্থ খরচের প্রয়োজন হবে না। তখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বিদ্যা অর্জন করে কেউ দুর্নীতিবাজ হবে না, আত্মস্বার্থে দেশ বিক্রি করার ষড়যন্ত্র করবে না। তারা হবে সুশিক্ষিত, নৈতিক চরিত্রে বলীয়ান সমাজের এক একটি আলোকবর্তিকা। তারা মানবতার কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবে, কোটি কোটি টাকার বিনিময়েও মানবতার ক্ষতি হয় এমন কাজ করার কথা তারা চিন্তাও করবে না। ছাত্রের কাছে একজন শিক্ষক হবেন শ্রদ্ধায় দেবতুল্য এবং ছাত্ররাও হবে শিক্ষকের আত্মার সন্তান। উম্মতে মোহাম্মদী নামক মহাজাতির শিক্ষক ছিলেন স্বয়ং আল্লাহর রসুল। তিনি তাঁর জাতিকে শিক্ষা দিয়েছিলেন কীভাবে মানবজাতির কল্যাণে নিজেদের সমস্ত সম্পদ ও জীবন কোরবানি করে দিতে হয়। তিনি ভোগবাদ শেখান নি, তিনি শিখিয়েছেন ‘দানে সম্পদ বাড়ে, সঞ্চয়ে হ্রাস পায়’। রসুলাল্লাহর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সেই অবজ্ঞাত উপেক্ষিত নিরক্ষর আরব জাতি বিস্ময়কর বিপ্লব সম্পাদন করেছিল, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সামরিক শক্তিতে পৃথিবীর শিক্ষকের আসন অধিকার করেছিল। তাঁর সামনে বসে নারী-পুরুষ উভয়ই শিক্ষা অর্জন করতেন, কাজেই প্রকৃত ইসলামের নারী-পুরুষ উভয়ই একই সঙ্গে শিক্ষা অর্জন করবেন।

সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে বিশ্বজগতে এবং মানবজাতিতে যে প্রাকৃতিক নিয়মগুলি বিরাজ করছে, মানুষ যখনই সেগুলির ব্যতিক্রম করার চেষ্টা করেছে, তখনই সে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। আজ আমাদের সমাজে যে অন্যায়, অরাজকতা, দুর্নীতি, অনৈক্য, অবিচার, বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে সেগুলি সবই প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে অস্বীকার করে জোর করে মানুষের মনগড়া বিধি-বিধান প্রয়োগ করার ফল। একজন শিক্ষিত মানুষ কখনোই প্রাকৃতিক নিয়মগুলির বাইরে যেতে চাইবে না। সে জানবে মানুষের জীবনে সঙ্কটগুলো কী কী, সেই সঙ্কট থেকে উত্তরণের উপায়গুলো কী কী। সে তার জ্ঞানকে নিঃস্বার্থভাবে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে। এভাবে জ্ঞানের স্রোতধারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলতে থাকবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের আগে পর্যন্ত আমাদের সমাজে স্রষ্টার দেওয়া মূল্যবোধ কিছুটা টিকে থাকায় শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক ছিল অনেকটা পিতা-পুত্রের সম্পর্কের মত। কিন্তু বর্তমানে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী জীবনদর্শনে প্রভাবিত সভ্যতা মানুষের ব্যবহারিক জীবনে স্রষ্টার বিধানের উপযোগিতা অস্বীকার করেছে। ফলশ্রুতিতে শিক্ষিত মানুষগুলি হয়ে পড়ছে স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক। শিক্ষিত সমাজের অবদানে প্রায় প্রতি বছর আমরা দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হচ্ছি। চাকরিগতপ্রাণ এই শ্রেণি একটি ভালো চাকরি পেলে বাবা-মাকে পর্যন্ত ভুলে যাচ্ছে। অফিসের কর্তাকে খুশি রাখতে পারলেই তার যথেষ্ট। এই শিক্ষাব্যবস্থা সার্টিফিকেটধারী অসংখ্য ব্যক্তির জন্ম দিচ্ছে। এরা যদি প্রত্যেকে নিজের উন্নতির পাশাপাশি জাতির ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকতো তাহলে অন্তত পশ্চিমা জাতিগুলির মত অন্তত এ জাতির অবস্থারও বহুদূর উন্নয়ন সম্ভবপর

হতো। কিন্তু আমাদের শিক্ষায় জাত্যবোধের শিক্ষা না থাকায় শিক্ষিতদের মধ্যে জাতির কল্যাণ সাধনের কোন প্রেরণা নেই। তাই তারা জাতির সম্পদ লুট করে বিদেশি ব্যাংকে টাকা জমায়। সেই টাকা থেকে লাভবান হয় সেই পশ্চিমারাই। এভাবেই শিক্ষিতরাই এ জাতিকে দিন দিন পিছিয়ে দিচ্ছে।

আজকে জাতীয় রাজনীতিতে যে হিংসা, হানাহানি, আক্রমণ, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, অহেতুক বিরোধিতা, সমস্ত দেশকে অচল করে দেয়ার সংস্কৃতি, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, অর্থাৎ জাতীয় জীবনে এই যে নৈরাজ্য এটাও শিক্ষিত শ্রেণির কাজের ফল, এবং এই চর্চা শুরুই হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে। অথচ কথা ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররা লেখাপড়া করতে যাবে। বিভিন্ন বাবা মায়ের সন্তানেরা এক জায়গায় এসে পড়বে ভাইবোনের মতো, শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের অপত্য স্নেহ- সব মিলিয়ে শিক্ষাঙ্গনে একটি স্বর্গীয় পরিবেশ বিরাজ করার কথা। কিন্তু আজ সেখানে চলে দৈনিক মিছিল, শ্লোগান- ওমুককে বাংলার মাটি থেকে বিতাড়িত করো, ওমুককে জবাই করো, ওমুকের লাশ ফেলে দাও। তারা প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের ছাত্রকে ছাত্ররা জবাই করে, পায়ের রগ কেটে দেয়, চোখ তুলে নেয়, তাদের অঙ্গপ্রতঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। পত্র-পত্রিকায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে এক ছাত্রকে আরেক ছাত্রের কোপানোর দৃশ্য আমাদেরকে প্রায়ই দেখতে হয়। এই ছাত্র নামের সন্ত্রাসীদের হাতে যখন জাতির নেতৃত্বের দায়িত্ব পড়ে তখন তাদের থেকে কেমন শান্তিময় জীবন আমরা আশা করতে পারি? ঠিক যেমনটা আজ দেখছি। শুধু ছাত্র নয়, শিক্ষকরাও অর্থ ও ক্ষমতার মোহে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর লেজুড়বৃত্তি করেন এবং নোংরা রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে যান। আজ ছাত্ররা জাতীয় রাজনীতির অন্যায়ের শিকার হচ্ছে, শিক্ষক-রাজনীতির শিকার হচ্ছে, এমন কি তাদের একটি বড় অংশ ধর্ম ব্যবসায়ীদের ধর্ম নিয়ে অপরাজনীতির কবলে পড়ছে।

আজকে জড়বাদী পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতি একমাত্র বৈষয়িক স্বার্থ হাসিল অর্থাৎ অর্থ-বিত্ত, যশ, খ্যাতি ইত্যাদিকে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হিসাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাবাধীন সমস্ত পৃথিবীতে এখন অর্থই মানুষের কাছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দু'চার শতাব্দী আগে পর্যন্তও প্রাচ্যের বৌদ্ধ, জৈন, সনাতন ধর্মী, ভারতীয় ইত্যাদির কাছে অর্থনীতির অত গুরুত্ব ছিলো না, পার্থিব জীবনের চেয়ে আত্মার ও চরিত্রের উৎকর্ষের সম্মান ছিলো বেশি। একজন কোটিপতির চেয়ে একজন জ্ঞানী, শিক্ষিত, চরিত্রবান কিন্তু গরীব লোককে সমাজ অনেক বেশি সম্মান করত। অথচ আজ অর্থবিত্তই সকল সম্মান, মর্যাদার মাপকাঠি। মনোহর পানপাত্রে বস্তুবাদী এই সভ্যতার পরিবেশিত এই গরল আমরা সুধা ভেবে পান করে চলেছি। পরিণামে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে আমাদের জীবন ওষ্ঠাগত, আত্মা মৃতপ্রায়। সেই দাসত্বের যুগে মদনমোহন তর্কালঙ্কার শিশু শিক্ষা বইতে লিখেছিলেন, 'লেখাপড়া করে যে/গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে।' আমাদের শৈশবে পিতা-মাতা ওই লাইন দু'টো গুরুত্বের সঙ্গে বুঝাতেন। তারা বলতেন, মন দিয়ে লেখাপড়া কর। লেখাপড়া করলে বড় চাকরি করতে পারবে, অনেক টাকার বেতন পাবে, দালানে থাকতে পারবে, গাড়িতে চড়ে ঘুরে বেড়াতে পারবে। মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করলে পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারবে, সবগুলো পাস দিয়ে উচ্চশিক্ষিত হলে লোকে ভালো বলবে, মান্য করবে। লেখাপড়া করলে জীবন তোমার সুখময় ও আনন্দময় হয়ে উঠবে।

লেখাপড়ার প্রতি বাবা-মায়ের আগ্রহ এবং সন্তানের প্রতি হিতোপদেশ শিশু সন্তানকে অনুপ্রাণিত করে। শিশু সন্তানটির মানসিকতাও তেমনটি গড়ে ওঠে। যেমন করে নরম কাদামাটি দিয়ে যে কোনো মূর্তি গড়ে তোলা যায়, তেমনি শিশুদের মনও কোমল থাকে, ইচ্ছানুরূপ গড়ে তোলা সম্ভব হয়। পিতামাতার মূল আশা থাকে সন্তান

শিক্ষিত হোক, বড় চাকরি করুক, সুখে থাকুক। সেই সুখী সন্তান বিনিময়ে পিতা-মাতাকে দেখভাল করবে, সেটা তারা খুব কমই আশা করেন। কেননা, সন্তানের জন্য পিতা-মাতার হৃদয় থাকে সমুদ্রসম।

বাস্তবে অনেক শিশুই পিতা-মাতার হিতোপদেশ অনুযায়ী চলতে, জীবন গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। একদিন যুবক হয়ে বড় চাকুরেও হয় যায়, গাড়িও পায়। কিন্তু পাশ্চাত্য ‘সভ্যতা’র প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবে সে শিক্ষিত সন্তানের মন-মানসিকতার আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। সেই শিক্ষিত সন্তানটির মন-মানসিকতায় স্থায়ী আসন গেড়ে বসে লোভ-লালসা-বিলাসিতা-আভিজাত্য। সে পরিণত হয় একটি অর্থ উপার্জনের কলে। স্কুলে-কলেজে তাকে নৈতিকতার কোন শিক্ষা দেওয়া হয় না। যখন সে প্রতিযোগিতামূলক দুনিয়ায় টাকা কামাইয়ের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, ছোট বেলায় বাবা-মায়ের কাছে পাওয়া নৈতিকতার শিক্ষাটুকু তখন আর মনে থাকে না। সমাজের কোথাও সে নৈতিকতার শিক্ষা পায় না। আত্মিক, নৈতিক শিক্ষা তথা আল্লাহর নিত্ত-উপস্থিতির ধারণা এদের ব্যক্তি জীবনে নেই বলে এদের নিজেদের লোভ, হিংসা অহংকার ইত্যাদির উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এগুলোর যা কিছু নিয়ন্ত্রণে থাকে তা শুধু শাস্তির ভয়ে। কাজেই অসৎ উপায়ে অর্জিত কালো টাকার মালিক হয়ে এরা লাগামহীনভাবে জীবন উপভোগ করে। সুযোগ পেলেই সে পরিণত হয় দুরাচারী মানবেতর জীবে, হয়ে ওঠে দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, নিজের স্বার্থে দেশের বা মানুষের বিরাট ক্ষতি সাধন করতেও তাদের আত্মা কাঁপে না।

যে ধর্মের দায়িত্ব ছিল মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করা, সেই ধর্মও আজ মানুষকে নৈতিকতার শিক্ষা দিতে চরমভাবে ব্যর্থ। কারণ ব্রিটিশরা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে আমাদেরকে তাদের তৈরি একটি বিকৃত বিপরীতমুখী ইসলাম শিখিয়ে গেছে। ধর্মও এখন একটি লাভজনক বৃত্তি বা বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত হয়েছে। প্রতিটি ধর্মেই আল্লাহ এবং মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী একটি শ্রেণি ধর্মের ধারক-বাহক, আলেম, আচার্য সেজে টাকার বিনিময়ে ওয়াজ নসিহত করছে, মসজিদে, চার্চে, মঠে, মন্দিরে মানুষকে দিয়ে উপাসনা, প্রার্থনা করাচ্ছে। টাকা ছাড়া তারা কোনো একটি কাজও করেন না, এমন কি জানাজার নামাজ পর্যন্ত টাকার বিনিময়ে পড়ান। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পুরোহিত শ্রেণির সঙ্গে অর্থের লেনদেন ঘটে। তারা তাদের ওয়াজে নসিহতে মানুষকে কেবল নামাজ, রোজা, হজ্ব ইত্যাদি করার জন্য উপদেশ দেন, এগুলিকেই তারা ইবাদত ও ধর্মকর্ম বলে মনে করেন। আল্লাহ বলেছেন যে তিনি মানুষকে ইবাদত করা ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেন নি। তাহলে কি সেই ইবাদত? না নামাজ রোজা করা মানুষের প্রকৃত ইবাদত নয়। ইবাদত কথাটির অর্থ হচ্ছে যে জিনিসকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সেই কাজ করা। একটি ঘড়ি তৈরি করা হয়েছে সময় দেখানোর জন্য, এটা করাই তার ইবাদত। সূর্য সৃষ্টি করা হয়েছে আলো তাপ দেওয়ার জন্য, এটা করাই তার ইবাদত। মানুষকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সেটা আগে জানতে হবে। কারণ সেটা করাই তার ইবাদত। মানুষকে কি মসজিদে, মন্দিরে, গির্জা, প্যাগোডায় গিয়ে বসে থাকার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে? না। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে পৃথিবীতে সত্য ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য। পৃথিবী যখন অশান্তির জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড হয়ে আছে, মানুষের মুখে ভাত নেই, মসজিদ থেকে জুতা পর্যন্ত চুরি হয়, যে সমাজে চার বছরের শিশু কন্যা পর্যন্ত ধর্ষিত হয় সেখানে এক শ্রেণির লোক মসজিদে গিয়ে পড়ে থাকে আর মনে করে ইবাদত করছেন, মন্দিরে গিয়ে দুধ-কলা দিয়ে মনে করেন যে উপাসনা করছেন, মক্কায় গিয়ে মনে করেন যে, ইবাদত করছেন। আসলে তাদের ইবাদত করা হচ্ছে না। মানুষের প্রকৃত ইবাদত হলো মানবতার কল্যাণে কাজ করা।

আল্লাহ বলেছেন, পূর্ব এবং পশ্চিমদিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নেই। কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, মালায়েকদের উপর এবং সমস্ত নবী-রসুলগণের উপর ঈমান আনবে, আর আল্লাহরই প্রেমে সম্পদ ব্যয় করবে আত্নীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও দাসমুক্তির জন্যে। আর যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণকারী তারাই হল সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই মুত্তাকী (সুরা বাকারা ১৭৭)। সুতরাং মানুষ কী করলে শান্তিতে থাকবে, দরজা খুলে ঘুমাবে সেই লক্ষ্যে কাজ করাই হলো ইবাদত। যারা মানবতার কল্যাণে এই কাজগুলি করবে, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করবে তাদের প্রশিক্ষণের জন্য, তাদের চরিত্র সৃষ্টি করার জন্য দরকার হলো নামাজ, রোজা ইত্যাদি। যেমন একটি বাড়িতে খুঁটি দেওয়া হয় ছাদকে ধোরে রাখার জন্য। যদি ছাদই না দেওয়া হয়, তাহলে শুধু খুটি গেঁড়ে কোন লাভ নেই। নামাজ রোজা হচ্ছে এই খুঁটির মত। তেমনি যারা শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করবে না, তাদের জন্য এই নামাজ-রোজা কোনো কাজে আসবে না। এগুলো তাদেরকে স্বর্গে বা জান্নাতে নিতে পারবে না।

বর্তমানে আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি দিকে চূড়ান্ত অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছি। সুগভীর চক্রান্তের মাধ্যমে আমাদের ইতিহাস আমাদের থেকে আড়াল করে রাখা হয়েছে, আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে নিজ জাতি সম্পর্কে সীমাহীন হীনমন্যতা এবং পাশ্চাত্যের প্রতি গোলামির মানসিকতা। যে জাতি নিজেদের অতীত গৌরব জানে না, তাদের ভবিষ্যতও অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে এটাই স্বাভাবিক। বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক গবেষক মনীষী স্যার জন সিলির কথা এখানে উদ্ধৃত করে দিতে চাই। তিনি বলেছেন, ইতিহাস হলো রাষ্ট্রনীতির মূল এবং রাষ্ট্রনীতি হলো ইতিহাসের পরিণতি।

Politics without history has no root.
History without politics has no fruit.
ইতিহাস ছাড়া রাজনীতির কোন শিকড় নাই।
রাজনীতি ছাড়া ইতিহাসের কোন ফল নাই।

সুতরাং ভবিষ্যৎ পথ চলা নির্ধারণ করতে হলে আগে আমাদের জানতে হবে কীভাবে এই অকার্যকর, ব্যর্থ, বিষবৃক্ষতুল্য জীবনব্যবস্থা আমাদের সমাজে তার কালো থাবা বিস্তার করলো তার সঠিক ইতিহাস। এই পুস্তিকাতে আমরা সংক্ষেপে এই বিষয়টির উপর আলোকসম্পাত করতে চেষ্টা করবো।

এই গ্রন্থের মূল ধারণা ও বিষয়বস্তু হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা এ যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর বিভিন্ন লেখা, তাঁর বক্তব্য ইত্যাদি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং তিনিই এ গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি যে লেখাই লিখতেন সেটা প্রকাশ করার আগে আমাদেরকে পড়তে দিতেন এবং লেখাটি আরও কীভাবে সমৃদ্ধ করা যায় সে বিষয়ে পরমার্শ চাইতেন। তাঁর সেই নির্দেশনা মোতাবেক আমরা চেষ্টা করেছি এ গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে। বইটিতে তথ্যগত কোন ভুলভ্রান্তি পরিলক্ষিত হলে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য পাঠকগণের কাছে বিনীত আর্জি রইলো।

-মো: রিয়াদুল হাসান

২০ আগস্ট ২০১৪ ঈসায়ী, ঢাকা

ইতিহাসের পদস্খলন

আদম (আ:) থেকে শুরু করে মোহাম্মদ (দ:) পর্যন্ত আল্লাহ যতো নবী রসুল (আ:) মানব জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য পাঠিয়েছেন তাদের প্রত্যেককেই যে মূল-মন্ত্র দিয়ে পাঠিয়েছেন তা হচ্ছে তওহীদ, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব। স্থান, কাল ও পাত্রের বিভিন্নতার কারণে দীনের অর্থাৎ জীবন ব্যবস্থার আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, ইবাদতের পদ্ধতি ইত্যাদি বিভিন্ন হয়েছে কিন্তু ভিত্তি, মূলমন্ত্র একচুলও বদলায় নি। সেটা সব সময় একই থেকেছে- আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, তওহীদ। প্রেরিত প্রত্যেক নবী-রসুলকে আল্লাহ এই দায়িত্ব দিয়েছেন তারা যেন তাদের নিজ নিজ জাতিকে এই তওহীদের অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে নিয়ে আসেন।

পূর্ববর্তী নবীদের যে কারণে আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন তাঁর এই শেষ নবীকেও সেই একই উদ্দেশ্যে পাঠালেন- অর্থাৎ পৃথিবীতে মানুষের জীবনে শান্তি, ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে। তাঁকে (দ:) নির্দেশ দিলেন- পৃথিবীতে যত রকম জীবন ব্যবস্থা দীন আছে সমস্তগুলিকে নিষ্ক্রিয়, বাতিল করে এই শেষ জীবন ব্যবস্থা মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে (সুরা তওবা ৩৩, সুরা ফাতাহ ২৮, সুরা সফ ৯)। কারণ শান্তির একমাত্র পথই আল্লাহর দেয়া ঐ জীবন বিধান। আল্লাহ তাঁর শ্রেষ্ঠ নবীকে শুধু নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি শেখাতে পাঠান নি, ওগুলো তাঁর সেই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে জাতির দরকার সেই জাতির চরিত্র গঠনের প্রক্রিয়া, উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য দীনুল কাইয়্যেমা, সেরাতুল মোস্তাকীমকে পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠা। এই বিশাল দায়িত্ব, সমস্ত পৃথিবীময় এই শেষ জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করা এক জীবনে অসম্ভব। বিশ্বনবী (দ:) তাঁর নবীজীবনের তেইশ বছরে সমস্ত আরব উপদ্বীপে এই শেষ জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করলেন- ইসলামের শেষ সংস্করণ মানব জীবনের একটি অংশে প্রতিষ্ঠা হলো। কিন্তু তাঁর উপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব সমস্ত পৃথিবী, সম্পূর্ণ মানব জাতি। যতদিন সম্পূর্ণ মানব জাতির উপর এই শেষ জীবন বিধান জাতীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা না হবে ততদিন মানুষ জাতি আজকের মতই অশান্তি, যুদ্ধবিগ্রহ, অবিচারের মধ্যে ডুবে থাকবে- শান্তি, ইসলাম আসবে না এবং বিশ্বনবীর (দ:) উপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্বও পূর্ণ হবে না।

আল্লাহর রসুল (দ:) আংশিকভাবে তাঁর দায়িত্ব পূর্ণ করে চলে গেলেন এবং তাঁর বাকি কাজ পূর্ণ করার ভার দিয়ে গেলেন তাঁর সৃষ্ট জাতির উপর, তাঁর উম্মাহর উপর। প্রত্যেক নবী তাঁর উপর দেয়া দায়িত্ব পূর্ণ করেছেন তার অনুসারীদের, তাঁর উম্মাহর সাহায্যে। কোন নবীই একা একা তাঁর কাজ, কর্তব্য সম্পাদন করতে পারেননি। কারণ তাঁদের প্রত্যেকেরই কাজ জাতি নিয়ে, সমাজ, জনসমষ্টি নিয়ে, ব্যক্তিগত নয়। কেউই পাহাড়ের গুহায়, নির্জনে, বা হুজরায় বসে তার কর্তব্য করেননি, তা অসম্ভব ছিল। শেষ নবীর (দ:) বেলাও তার ব্যতিক্রম হয় নি। নবুয়ত পাবার মুহূর্ত থেকে ওফাত পর্যন্ত পৃথিবীর ব্যস্ততম মানুষটির জীবন কেটেছে মানুষের মধ্যে, জনকোলাহলে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে, সশস্ত্র সংগ্রামে- এ ইতিহাস অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। নবুয়তের সমস্ত জীবনটা বহির্মুখী- যে দীন তিনি আল্লাহর কাছ থেকে এনে আমাদের দিলেন সেটার চরিত্রও হলো বহির্মুখী (Extrovert) সংগ্রামী। আল্লাহর রসুল (দ:) তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব যে তাঁর উম্মাহর উপর ন্যস্ত করে গেলেন তা যে তাঁর উম্মাহ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিল তার প্রমাণ হলো তাঁর উম্মাহর পরবর্তী কার্যক্রমের ইতিহাস। কারণ বিশ্বনবীর (দ:) লোকান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উম্মাহ তাদের বাড়িঘর, স্ত্রী-পুত্র, ব্যবসায়-বাণিজ্য-এক কথায় দুনিয়ার ভোগবিলাস ত্যাগ করে তাদের প্রাণপ্রিয় নেতার অসমাপ্ত কাজ পূর্ণ করতে দেশ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েছিল। মানুষের ইতিহাসে এমন ঘটনা নেই যে, একটি সম্পূর্ণ জাতি এক মহান আদর্শ পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য পার্থিব সব কিছু ত্যাগ করে দেশ থেকে বের হয়ে পড়েছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তারা তদানীন্তন পৃথিবীর

দুইটি মহাশক্তিকে সশস্ত্র সংগ্রামে, যুদ্ধে পরাজিত করে সমগ্র মধ্য এশিয়ায় আল্লাহর আইনের শাসন কার্যকরী করেছিল। ঐ মহাশক্তিশালী সাম্রাজ্য দুইটি ছিল রোমান ও পারসিক, একটি খ্রিস্টান অপরটি অগ্নি উপাসক। সংখ্যায়, সম্পদে, সামরিক বাহিনীর সংখ্যায়, অস্ত্রশস্ত্রে, এক কথায় সবদিক দিয়ে ঐ দুইটি বিশ্বশক্তি ছিল ঐ শিশু জাতির চেয়ে বহুগুণে বড় কিন্তু তবুও তারা ঐ সদ্যপ্রসূত ছোট্ট জাতির সঙ্গে সামরিক সংঘর্ষে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। খ্রিস্টান শক্তিটি পরাজিত হয়ে মধ্যপ্রাচ্য থেকেই পালিয়ে গেলো; আর অগ্নি উপাসক শক্তিটি আল্লাহর দীনকে স্বীকার করে নিয়ে ঐ নতুন জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো; আজ যেটাকে আমরা ইরান বলি। তারপর ৬০ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ঐ জাতিটি তখনকার দিনের অর্ধেক পৃথিবী জয় করে আল্লাহর আইনের শাসনের অধীনে নিয়ে এলো। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হলো ন্যায়, সুবিচার, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা এক কথায় শান্তি। সমাজে কোনো লোক না খেয়ে থাকতো না।

সম্পদের এমন প্রাচুর্য তৈরি হয়েছিলো যে, দান গ্রহণ করার মত লোক খুঁজে পাওয়া যেতো না। এমন সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, একজন যুবতী মেয়ে সমস্ত গায়ে অলংকার পরিহিত অবস্থায় শত শত মাইল পথ অতিক্রম করতে পারতো, তার মনে একমাত্র আল্লাহ এবং বন্য জন্তু ছাড়া অন্য কিছুর ভয় জাগ্রত হতো না। ঘুমানোর সময় মানুষ ঘরের দরজা বন্ধ করার প্রয়োজন বোধ করত না। মানুষ অতি সংগোপনে, রাতের অন্ধকারেও আল্লাহর ভয়ে অন্যায়, মন্দ কাজ থেকে তারা বিরত থাকত। ফলে আদালতে মাসের পর মাস 'অপরাধ সংক্রান্ত' কোন অভিযোগ আসত না। স্বর্ণের দোকান খোলা রেখে মানুষ অন্যত্র চলে যেত। আল্লাহর দেওয়া সত্য জীবনব্যবস্থার প্রভাবে সত্যবাদিতা, আমানতদারি, পরোপকার, মেহমানদারি, উদারতা, ত্যাগ, দানশীলতা ইত্যাদি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে মানুষের চরিত্র পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাদের ওয়াদার মূল্য ছিল তাদের জীবনের চেয়েও বেশি। প্রকৃত ইসলাম আইয়ামে জাহেলিয়াতের বর্বর, কলহবিবাদে লিপ্ত, অশ্লীল জীবনাচারে অভ্যস্ত জাতিটিকেই এমন সুসভ্য জাতিতে পরিণত করেছিল যে তারা অতি অল্প সময়ে পৃথিবীর সকল জাতির শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়েছিল।

আল্লাহর রসুল (দ:) বলেছিলেন- আমার উম্মাহর (জাতির) আয়ু ৬০/৭০ বছর। এর প্রকৃত অর্থ হলো এই যে, তাঁর রসুল (দ:) জাতি ঐ ৬০/৭০ বছর পর্যন্ত তার কাজ চালিয়ে গেছে। তারপর তারা ঐ কাজে বিরতি দিলো, কারণ ঐ উদ্দেশ্যটা ভুলে গেলো। তাদের দৃষ্টি, তাদের প্রকৃত লক্ষ্য, যে লক্ষ্য আল্লাহ ও তাঁর রসুল (দ:) নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন তা থেকে ঘুরে যেয়ে যে সহজ-সরল দীনকে সংগ্রামের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার কথা সেটাকে চুলচেরা বিশ্লেষণের মধ্যে ব্যাপৃত হয়ে পড়লো এবং পরিণামে জাতিটির মধ্যে বহু মাজহাব, ফেরকা, দল, মত সৃষ্টি হয়ে তা শত শত ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। পরিণামে জাতিটি ধ্বংস হয়ে গেলো। কিন্তু এই ধ্বংস হবার কারণ শুধু পণ্ডিতদের ঐ অতি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণই নয়। আরও একটি প্রধান কারণ আছে আর তা হলো এই দীনুল কাইয়্যেমাতে, সেরাতুল মোস্তাকীমের মধ্যে বিকৃত সুফী মতবাদ অর্থাৎ ভারসাম্যহীন অধ্যাত্মবাদের অনুপ্রবেশ।

আল্লাহ মানুষের জন্য যত জীবনব্যবস্থা পাঠালেন যুগে যুগে, তাঁর শেষটাকে তিনি তৈরি করলেন একটা অপূর্ব ভারসাম্য (Balance) দিয়ে। এর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্টই হলো ভারসাম্য। এর আগের দীনগুলিতে যে ভারসাম্য ছিল না তা নয়, মূল দীনে ভারসাম্য অবশ্যই ছিল। কারণ মানুষ শুধু দেহ নয় আত্মাও, শুধু সামাজিক জীব নয়, তার ব্যক্তিগত জীবনও আছে। তাই তাঁর জীবন-বিধান, দীনও একতরফা হতে পারে না। সেটাকে অবশ্যই এমন হতে হবে যে সেটা মানুষের উভয় রকম প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে, নইলে সেটা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই

আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা অবশ্যই সব সময় মূলতঃ ভারসাম্যযুক্ত ছিল। কিন্তু পূর্ববর্তী সব নবীদের (আ:) উপর অবতীর্ণ দীনগুলি ছিল স্থান ও কালের প্রয়োজনের মধ্যে সীমিত এবং ওগুলোর ভারসাম্যও ছিল ঐ পটভূমির প্রেক্ষিতে সীমিত। কিন্তু ঐ দীনগুলির ভারসাম্যও মানুষ নষ্ট করে ফেলেছে। হয় বিধানের আদেশ-নিষেধগুলিকে আক্ষরিকভাবে পালন করতে যেয়ে দীনের মর্মকে, আত্মাকে হারিয়ে ফেলেছে, না হয় দীনের সামাজিক বিধানগুলিকে যেগুলো মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করবে সেগুলিকে ত্যাগ করে শুধু আত্মার উন্নতির জন্য সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে। উভয় অবস্থাতেই দীনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। ঐ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে আল্লাহকে আবার প্রেরিত, নবী পাঠাতে হয়েছে। শেষ যে জীবন-বিধান স্রষ্টা পাঠালেন তাঁর শেষ নবীর (দ:) মাধ্যমে এটা এলো সমগ্র মানবজাতির জন্য। এর মধ্যে মানুষের সমষ্টিগত জীবনের জন্য রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আইন, বিচার ও দণ্ডবিধিও যেমন রইলো, তেমনি তার ব্যক্তিগত জীবনের আত্মার উন্নতিরও ব্যবস্থা রইলো। দু'টোই রইলো- কিন্তু ভারসাম্যযুক্ত অবস্থায়। কোর'আনে স্রষ্টা এ ব্যাপারে পরিষ্কার করে বলে দিলেন- আমি তোমাদের একটি ভারসাম্যযুক্ত জাতি করে সৃষ্টি করলাম (কোর'আন-সুরা আল-বাকারা ১৪৩)। এই ভারসাম্য যদি নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ যে কোন একদিকে ঝুঁকে পড়ে তবে যে কোন ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যায়। অধ্যাত্মবাদ এই দীনে প্রবেশ করে এর ভারসাম্য নষ্ট করে দিলো কারণ এই মতবাদ এই জীবন-ব্যবস্থার সমষ্টিগত দিকটা, যার মধ্যে আল্লাহর দেয়া রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাগুলি রয়েছে সেগুলোকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এর শুধু ব্যক্তিগত ও আত্মার উন্নতির প্রক্রিয়াকে আঁকড়ে ধরাকেই ধর্মকর্ম সাব্যস্ত করলো। একদিকে পণ্ডিতরা ফকিহ, মুফাস্সেররা এই দীনের আইন-কানুনকে তন্ন তন্ন বিশ্লেষণ করতে শুরু করলেন। দু'দল দু'দিকে ঝুঁকে পড়লেন। ভারসাম্য আর রইলো না, হারিয়ে গেলো। যে কাজের জন্য বিশ্বনবী (দ:) প্রেরিত হয়েছিলেন, যে কাজের জন্য তাঁর উম্মাহ সর্বস্ব ত্যাগ করে পৃথিবীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সে কাজ উপেক্ষিত হয়ে পরিত্যক্ত হলো। উম্মতে মোহম্মদী ঐ খানেই শেষ হয়ে গেলো জাতি হিসাবে। এই যে দু'টি ভাগ হলো, দু'টি ভাগই হলো অন্তর্মুখী (Introvert)। ফকিহ মুফাস্সের ইত্যাদিরা বই, কিতাব, কলম, কাগজ নিয়ে ঘরে ঢুকলেন, আর সুফীরা তসবীহ নিয়ে হুজরায় আর খানকায় ঢুকলেন। বিশ্বনবী (দ:) ও তাঁর আসহাবদের অসমাপ্ত কাজ করার জন্য বিক্ষিপ্তভাবে কিছু সংখ্যক মাত্র লোক রইলেন যারা এই জাতির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, সেরাতুল মোস্তাকীম ও দীনুল কাইয়্যেমাকে ভুললেন না। কিন্তু জাতি হিসাবে এই উম্মাহ আর উম্মতে মোহাম্মদীও রইলো না সেরাতুল মোস্তাকীম, সহজ-সরল রাস্তায়ও রইলো না। এরই ভবিষ্যত বাণী করে শেষ নবী (দ:) বলেছিলেন- আমার উম্মাহর আয়ু ৬০/৭০ বছর। কারণ তাঁর (দ:) ওফাতের ৬০/৭০ বছর পরই এই মহা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছিল।

যখন উম্মতে মোহাম্মদীর জাতি হিসাবে মৃত্যু হলো তখন কি রইলো? রইলো জাতি হিসাবে মুসলিম। মুসলিম শব্দের অর্থ হলো- যে বা যারা আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থাকে তসলীম অর্থাৎ সসম্মানে গ্রহণ করে নিজেদের জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিষ্ঠা করে, অন্য কোন রকম জীবন বিধানকে স্বীকার করে না, সে বা তারা হলো মুসলিম। এই জাতি রসুলাল্লাহর (দ:) প্রকৃত সুন্নাহ অর্থাৎ তাঁর মাধ্যমে প্রেরিত দীনকে সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম ছেড়ে দেবার ফলে জাতি হিসাবে প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদীর সংজ্ঞা থেকে বিচ্যুত হয়ে শুধু একটি মুসলিম জাতিতে পরিণত হলো। এ জাতির সংবিধান রইলো কোর'আন ও হাদিস, রাজনৈতিক, আর্থ সামাজিক সবরকম ব্যবস্থা শাসন ও দণ্ডবিধি (Penal Code) সবই রইলো ঐ কোর'আন ও হাদিস মোতাবেক। ওর বাইরে অন্য কোন রকম রাজনৈতিক বা আর্থ সামাজিক ব্যবস্থাকে তারা শেরক বলে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের সৃষ্টি করার প্রকৃত উদ্দেশ্য তারা হারিয়ে ফেলেছিলেন অর্থাৎ তাদের আকিদা বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন

আগের নিঃস্ব জাতিটি তখন আটলান্টিকের তীর থেকে চীনের সীমান্ত আর উত্তরে উরাল পর্বতমালা থেকে দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের তীর পর্যন্ত বিশাল এলাকার শাসনকর্তা। তারা তখন সম্পদে, সামরিক শক্তিতে জনবলে প্রচণ্ড শক্তিধর, পৃথিবীর কোন শক্তির সাহস নেই এই জাতির মোকাবেলা করার। এমন একটি সময়ে এসে দুর্ভাগ্যক্রমে এই উম্মাহ তার আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভুলে গেলো, এর আকিদা নষ্ট হয়ে গেলো, পৃথিবীতে শান্তি (ইসলাম) প্রতিষ্ঠার বদলে তাদের আকিদা হয়ে গেলো রাজত্ব করা, অন্য দশটা সাম্রাজ্যের মত।

কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ত্যাগ করলেও যেহেতু তারা এই শেষ জীবনব্যবস্থা, দীনের উপরই মোটামুটি কায়েম রইলো তাই এর সুফলও তারা লাভ করলো। কোর'আনের ও হাদিসের নির্দেশ মোতাবেক শাসন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করার ফলে জাতি আইন শৃঙ্খলা ও সম্পদ বিতরণে অপূর্ব সাফল্য লাভ করলো, আল্লাহ ও রসুলের (দ:) জ্ঞান আহরণের আদেশ উৎসাহ ভরে পালন করে অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর শিক্ষকের আসনে উপবিষ্ট হলো। যে সময়টার (Period) কথা আমি বলছি অর্থাৎ জাতি হিসাবে সংগ্রাম ত্যাগ করে উম্মতে মোহাম্মদীর সংজ্ঞা থেকে পতিত হওয়া থেকে কয়েকশ' বছর পর ইউরোপের বিভিন্ন জাতির পদানত ও গোলামে পরিণত হওয়া পর্যন্ত এই যে সময়টা, এই সময়টা পার্থিব হিসাবে অর্থাৎ রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা ইত্যাদিতে এক কথায় উন্নতি ও প্রগতি বোলতে যা বোঝায় তাতে এই জাতি পৃথিবীর সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে রইলো। শেষ নবীর (দ:) মাধ্যমে শেষ জীবন ব্যবস্থা মোটামুটি নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠা করার অনিবার্য ফল হিসাবে এই জাতি এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হলো যে, তদানীন্তন বিশ্ব সভয়ে ও সসম্ভ্রমে এই জাতির সামনে নতজানু হয়ে পড়েছিল। এই সময়ে এই জাতির সাফল্য, কীর্তি, বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে জ্ঞানার্জন, গবেষণা, পৃথিবীর অজানা স্থানে অভিযান ইত্যাদি প্রতি বিষয়ে যে সাফল্য লাভ করেছিল তার বিবরণ এখানে দেওয়ার স্থান নেই এবং প্রয়োজনও নেই। এ ব্যাপারে বহু বই কিতাব লেখা হয়ে গেছে। এই সময়টাকেই (Period) বলা হয় ইসলামের স্বর্ণযুগ।

কিন্তু এত কিছুতেও কোন লাভ নেই- কারণ আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হলে বাকি আর যা কিছু থাকে সবই অর্থহীন। এ সত্য রসুলাল্লাহর (দ:) ঘনিষ্ঠ সহচর এই জাতির প্রথম খলিফা আবু বকর (রা:) জানতেন। তাই খলিফা নির্বাচিত হয়ে তার প্রথম বক্তৃতাতেই তিনি উম্মতে মোহাম্মদীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন- হে মুসলিম জাতি! তোমরা কখনই সংগ্রাম (জেহাদ) ত্যাগ করো না। যে জাতি জেহাদ ত্যাগ করে- আল্লাহ সে জাতিকে অপদস্থ, অপমানিত না করে ছাড়েন না। আবু বকর (রা:) এ কথা তাঁর প্রথম বক্তৃতাতেই কেন বলেছিলেন? তিনি বিশ্বনবীর (দ:) ঘনিষ্ঠতম সাহাবাদের একজন হিসাবে এই দীনের প্রকৃত মর্মবাণী, হকিকত তাঁর নেতার কাছ থেকে জেনেছিলেন। বিশ্বনবীর কাছ থেকে জানা ছাড়াও আবু বকর (রা:) আল্লাহর দেয়া সতর্কবাণীও কোর'আনে নিশ্চয়ই পড়েছিলেন যেখানে আল্লাহ এই মো'মেন জাতি ও উম্মতে মোহাম্মদীকে লক্ষ্য করে বোলছেন- যদি তোমরা (জেহাদের) অভিযানে বের না হও তবে তোমাদের কঠিন শাস্তি (আযাব) দেবো এবং তোমাদের বদলে (তোমাদের পরিত্যাগ করে) অন্য জাতিকে মনোনীত করবো (কোর'আন- সুরা আত তওবা ৩৯)। শুধু আবু বকর (রা:) নয়, তারপর ওমর (রা:), ওসমান (রা:) এবং আলী (রা:) ও যে ঐ মর্মবাণী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন তার প্রমাণ এই যে, তাদের সময়েও এই শেষ জীবনব্যবস্থাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র সংগ্রাম নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যাওয়া হয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদা তো নয়ই এমনকি মহানবীর (দ:) একজন মাত্র সাহাবাও কোনদিন এই সশস্ত্র সংগ্রামের বিরতির জন্য একটিমাত্র কথা বলেছেন বলে ইতিহাসে প্রমাণ নেই। বরং প্রতিটি সাহাবা তাদের পার্থিব সব কিছু কোরবান করে স্ত্রী পুত্রকে আল্লাহর হাতে সঁপে দিয়ে বছরের পর বছর আরব থেকে বহু দূরে অজানা অচেনা দেশে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। আবু বকরের (রা:) মত তারাও জানতেন যে, এই সংগ্রাম বিশ্বনবীর

(দ:) উপর আল্লাহর অর্পিত দায়িত্ব, যা তাঁর উম্মাহ হিসাবে তাদের উপর এসে পড়েছে। তারা জানতেন এ সংগ্রাম ত্যাগ করার অর্থ উম্মতে মোহাম্মদীর গণ্ডি থেকে তাদের বহিঃষ্কার, আল্লাহর রোষানলে পতিত হওয়া ও পরিণামে আল্লাহর শত্রুদের হাতে পরাজিত, অপমান, অপছন্দ ও লাঞ্ছনা, যা আবু বকর (রা:) বলেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক জাতি সেই কাজটিই করল। তারা জাতির মধ্যে সৃষ্ট আলেম-পণ্ডিতদের দীনের অতি-বিশ্লেষণের কারণে বিভিন্ন মাজহাব ও ফেরকায় বিভক্ত হয়ে গেল এবং সুফি-দরবেশদের বিকৃত তাসাউফের অনুসরণ করে বহির্মুখী, বিস্ফোরণমুখী চরিত্র হারিয়ে অন্তর্মুখী হয়ে গেল।

জাতির এই পচনক্রিয়া যে কয়েকশ' বছর ধরে চললো এই সময়টায় কিন্তু এই উম্মাহর শত্রুরা বসে ছিল না। তারা ক্রমাগত চেষ্টা করে চলছিল এই জাতিকে ধ্বংস করার জন্য। কিন্তু এই উম্মাহর জনক মহানবী (দ:) এর মধ্যে যে বিপুল পরিমাণ সামরিক গুণ ও চরিত্র সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন তার প্রভাবে ইউরোপিয়ান শক্তিগুলি কোন বড় রকমের বিজয় লাভ করতে পারে নি। কিন্তু ফকীহ, মুফাস্সের ও সুফীদের প্রভাবে উম্মাহর আকিদা বিকৃত হয়ে যাবার ফলে পচনক্রিয়া আরও যখন ভয়াবহ হয়ে উঠলো তখন আর এই জাতির শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার শক্তি রইলো না। ফলে তারা হয়ে গেল ইউরোপীয় খ্রিস্টান জাতিগুলির গোলাম। এই বার শত্রু যখন তাদের নিজের তৈরি আইন ও শাসনব্যবস্থা তাদের দাস জাতির উপর প্রবর্তন করলো তখন এই জাতি আর ঐ মুসলিমও রইলো না, হয়ে গেলো তাদের প্রভুদের মত মোশরেক ও কাফের। পূর্ববর্তী দীনগুলির বিকৃত অবস্থা ও মানুষের তৈরি আইন-কানুন ধ্বংস করে আল্লাহর পাঠানো আইন-কানুন প্রবর্তন করে পৃথিবীময় শান্তি (ইসলাম) প্রতিষ্ঠা যে জাতির দায়িত্ব সেই জাতিই যদি জাতীয় জীবনে ঐ আইন-কানুন পরিত্যাগ করে যে আইন-কানুন ধ্বংস করার কথা সেই আইন-কানুন গ্রহণ করে তবে সে জাতির রইলো কি? জাতীয় জীবনে মানুষের তৈরি, ইউরোপের তৈরি আইন-কানুন গ্রহণ করে এই জাতি কার্যতঃ মোশরেক ও কাফের হয়ে গেলো এবং সেই যে মোশরেক ও কাফের হলো তা থেকে সে আজও প্রত্যাবর্তন করে নি, আজও সেই মোশরেকই আছে।

কোন সন্দেহ নেই যে এই জাতিটা ইউরোপের দাসে পরিণত হবার পরও বহু লোক আল্লাহ ও তাঁর রসুলে (দ:) পরিপূর্ণ বিশ্বাসী ছিল, কিন্তু সে বিশ্বাস ছিল ব্যক্তিগতভাবে, জাতিগতভাবে নয়। কারণ জাতিগতভাবে তাদের রাজনৈতিক আর্থ সামাজিক ও শিক্ষাব্যবস্থা তো তখন ইউরোপিয়ান খ্রিস্টানদের হাতে এবং তারা ইসলামী ব্যবস্থা বদলে নিজেদের তৈরি ব্যবস্থা এই জাতির জীবনে প্রতিষ্ঠা করেছে। জাতীয় জীবন থেকে আল্লাহর দেয়া রাজনৈতিক, আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা কেটে ফেলে শুধু ব্যক্তিগত জীবনে তা বজায় রাখলে আল্লাহর চোখে মুসলিম বা মো'মেন থাকা যায় কিনা এ প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর হচ্ছে- না, থাকা যায় না। তাঁর বই কোর'আনে আল্লাহ বলেছেন- তোমরা কি বইয়ের (কোর'আনের) কিছু অংশ বিশ্বাস কর, আর কিছু অংশ বিশ্বাস কর না? যারা তা করে (অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ সমূহের এক অংশ বিশ্বাস করে না বা তার উপর আমল করে না) তাদের প্রতিফল হচ্ছে এই পৃথিবীতে অপমান, লাঞ্ছনা এবং কেয়ামতের দিনে কঠিন শাস্তি। তোমরা কী করছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ বেখেয়াল নন (কোর'আন সুরা আল বাকারা ৮৫)। লক্ষ্য করুন, আল্লাহ পরিষ্কার ভাষায় কী বলেছেন। তাঁর আদেশ নিষেধগুলির কতকগুলি মেনে নেয়া আর কতকগুলিকে না মানার অর্থ আল্লাহকে আংশিকভাবে মানা অর্থাৎ শেরক। তারপর বলছেন এর প্রতিফল শুধু পরকালেই হবে না এই দুনিয়াতেও হবে আর তা হবে অপমান ও হীনতা। আল্লাহ মো'মেনদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন উভয় দুনিয়াতে অন্য সবার উপর স্থান ও সম্মান। এ প্রতিশ্রুতি তার কোর'আনের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এখন যদি এই লোকগুলিকে তিনি বলেন, তোমাদের জন্য এই দুনিয়াতে অপমান ও কেয়ামতে কঠিন শাস্তি, শব্দ ব্যবহার করেছেন 'শাদীদ' ভয়ংকর তবে আল্লাহ তাদের নিশ্চয়ই মো'মেন

বলে স্বীকার করছেন না। যদিও তাদের ব্যক্তিগত জীবনের আল্লাহর আইন-কানুন (শরিয়াহ) তারা পুংখানুপুংখভাবে মেনে চলেন।

আল্লাহ কোর'আনে আরো বলেছেন- হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পূর্ণভাবে সম্পূর্ণভাবে এসলামে প্রবিষ্ট হও (কোর'আন, সুরা বাকারা- ২০৮)। আকিদা বিকৃতি হয়ে যাওয়ার ফলে আজ আল্লাহর এই আদেশের অর্থ করা হয় এই যে, ইসলামের খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলি পালন কর। আসলে এই আয়াতে আল্লাহ মো'মেনদের অর্থাৎ যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে তাদের বললেন যে, ইসলামকে অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানকে সম্পূর্ণ ও পূর্ণভাবে গ্রহণ কর এর কোন একটা অংশকে নয়। শুধু জাতীয়, রাষ্ট্রীয় অংশটুকু নয় ব্যক্তিগত অংশকে বাদ দিয়ে, কিম্বা শুধু ব্যক্তিগত অংশটুকু নয়, জাতীয় অংশকে বাদ দিয়ে। ঐ কথার পরই তিনি বলছেন- এবং শয়তানের কথামত চলো না। অর্থাৎ ঐ আংশিকভাবে এসলামে প্রবেশ করলে তা শয়তানের অনুসরণ করা হবে, শয়তানের কথামত চলা হবে। শয়তান তাই চায়, কারণ আংশিকভাবে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনে আল্লাহর আইন, বিধান প্রতিষ্ঠা না করে শুধু ব্যক্তিগত জীবনে তা মেনে চললে সুবিচার ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা হবে না এবং অন্যায়, অশান্তি ও রক্তপাত চলতেই থাকবে। যেমন আজ শুধু পৃথিবীতে নয়, মুসলিম নামের এই জাতিতেও নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ও অন্যান্য খুঁটিনাটি পূর্ণভাবে পালন করা সত্ত্বেও পৃথিবীতে অশান্তির জয়জয়কার, বইছে রক্তের বন্যা। সুতরাং এই জাতি (উম্মাহ) যখন ইউরোপিয়ানদের কাছে যুদ্ধে হেরে যেয়ে তাদের দাসে পরিণত হলো এবং তাদের রাজনৈতিক, আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা যখন তাদের বিদেশি প্রভুরা পরিবর্তন করে তাদের নিজেদের তৈরি ব্যবস্থা প্রবর্তন করলো, তখন আর এই জাতি মুসলিমও রইলো না, হয়ে গেল মোশরেক এবং কাফের।

ইউরোপিয়ান খ্রিস্টানদের দাসে পরিণত হবার পরও এ জাতির চোখ খুললো না। মনে এ চিন্তাও এলো না যে, একি? আমার তো অন্য জাতির গোলাম হবার কথা নয়। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি তো এর উল্টো, আমাকেই তো পৃথিবীর সমস্ত জাতির উপর প্রাধান্য দেবার প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন (সুরা নুর ৫৫)। আমরা যখন মুষ্টিমেয় ছিলাম তখন তো আমাদের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারে নি। ঐ মুষ্টিমেয় যোদ্ধার কারণে আমরা পৃথিবীর একটা বিরাট অংশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলাম। কিন্তু কোথায় কি হলো? সেই মুষ্টিমেয়র কাছে পরাজিত শত্রু আজ আমাদের জীবন বিধাতা। এসব চিন্তা এ জাতির মনে এলো না কারণ কয়েক শতাব্দী আগেই তাদের আকিদা বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। কোর'আন হাদিসে পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ করে পণ্ডিতরা এ জাতির এক অংশের আকিদা এই করে দিয়েছিলেন যে, ব্যক্তিগতভাবে খুঁটিনাটি শরিয়াহ পালন করে চললেই "ধর্ম পালন" করা হয় এবং পরকালে জান্নাত লাভ হবে। অন্যদিকে ভারসাম্যহীন বিকৃত তাসাওয়াফ অনুশীলনকারীরা জাতির অন্য অংশের আকিদা এই করে দিয়েছিলেন যে, দুনিয়াবিমুখ হয়ে নির্জনতা অবলম্বন করে ব্যক্তিগতভাবে আত্মার ঘষামাজা করে পবিত্র হলেই 'ধর্ম পালন' করা হয় ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়। জাতীয় জীবন কোন্ আইনে চলছে, কার তৈরি দণ্ডবিধিতে (Penal code) আদালতে শাস্তি হচ্ছে তা দেখবার দরকার নেই। এই আকিদা (Attitude, Concept) দৃষ্টিভঙ্গি যে বিশ্বনবীর (দ:) শিক্ষার বিপরীত তা উপলব্ধি করার শক্তি তখন আর এ জাতির ছিল না। কারণ ফতোয়াবাজীর জ্ঞানই যে একমাত্র জ্ঞান, পৃথিবীর অন্যান্য কোন জ্ঞানের প্রয়োজন নেই, পণ্ডিতদের এই শিক্ষার ও ফতোয়ার ফলে এই জাতি একটি মূর্খ জাতিতে পর্যবসিত হয়ে গিয়েছিল, দৃষ্টি অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। স্থানে স্থানে কিছু সংখ্যক লোক বাদে সমস্ত জাতিটাই এই অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকারের মধ্যে বসে ভারবাহী পশুর মত ইউরোপিয়ান প্রভুদের পদসেবা করলো কয়েক শতাব্দী ধরে। এই কয়েক শতাব্দীর দাসত্বের সময়ে এই জাতির একটি বড় অংশ অকৃত্রিম হৃদয়ে তার খ্রিস্টান প্রভুদের সেবা করেছে। প্রভুরা যখন নিজেদের মধ্যে

মারামারি করেছে তখন এরা যার যার প্রভুর পক্ষ নিয়ে লড়েছে ও প্রাণ দিয়েছে। যে মহামূল্যবান প্রাণ শুধুমাত্র পৃথিবীতে শান্তি (ইসলাম) প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে উৎসর্গ করার কথা সে প্রাণ এরা দিয়েছে ইউরোপিয়ান খ্রিস্টান প্রভুদের সাম্রাজ্য বিস্তারের যুদ্ধে, প্রভুদের নিজেদের মধ্যে মারামারিতে। আল্লাহর শাস্তি কী ভয়ংকর!

ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষাব্যবস্থা

এখন দেখা দরকার এই জাতিটিকে পরাজিত করে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে তাদের আল্লাহ প্রদত্ত আইন-কানুন নিষিদ্ধ করে মোশরেক ও কাফের বানানোর পর ইউরোপিয়ান জাতিগুলি তাদের প্রভুত্ব স্থায়ী করার জন্য কি কি ব্যবস্থা নিলো। এই নতুন প্রভুরা বোকা ছিল না। তারা ভালো করেই জানতো যে, কোন জাতিকে তারা শৃঙ্খলিত করতে পেরেছে এবং কেন পেরেছে। বুদ্ধিমান শত্রু বুঝছিল যে, যে জাতির সামনে তারা একদিন ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মত উড়ে গিয়েছিল তাদের তারা আজ পদানত করতে পেরেছে, কারণ জাতিটি তাদের জন্য যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করে দেয়া ছিল তা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং ঐ লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার ফলশ্রুতিতে তাদের বহির্মুখী ও বিস্ফোরণমুখী চরিত্র পরিবর্তীত হয়ে অন্তর্মুখী হয়ে জাতির গতি রুদ্ধ হয়ে স্থবির হয়ে গিয়েছে এবং এই গতিহীনতা ও স্থবিরত্বের অবশ্যম্ভাবী ফল জাতির পণ্ডিতরা তাদের জীবন ব্যবস্থা দীনের আদেশ নিষেধগুলির চুলচেরা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে নানা রকম মাযহাব ও ফেরকা সৃষ্টি করার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং বিকৃত ভারসাম্যহীন সুফীরা আত্মা ঘষামাজার নানা পন্থা তরিকা সৃষ্টি করার সুযোগ ও সময় পেয়েছিলেন। শত্রু এও বুঝেছিল যে, যতদিন তারা তাদের দাস জাতিটাকে ঐ লক্ষ্য ভুলিয়ে রাখতে পারবে, যতদিন এই জাতি তাদের দীনের ব্যবহারিক দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি নিয়ম কানুনের মসলা মাসায়েল পালন নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, যতদিন তারা তাদের আত্মা পরিষ্কার, ধোয়া মোছায় এক কথায় 'ধর্মকর্মে' ব্যাপৃত থাকবে ততদিন তাদের কোন ভয় নাই। কিন্তু একবার যদি এই জাতি কোনওভাবে আল্লাহ ও তাদের নেতা (দ:) যে লক্ষ্য, যে দিক-নির্দেশনা হেদায়াত তাদের দিয়েছেন তা ফিরে পায় তবে ঠিক আগের মতই তারা আবার এই জাতির সামনে শুকনো পাতার মত উড়ে যাবে এবং তাদের প্রকৃত লক্ষ্যকে যদি তাদের সামনে থেকে আড়াল করে রাখতে হয় তবে তাদের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

বুদ্ধিমান শত্রুরা ঠিক এই পদক্ষেপই নিলো। নিদারুণ পরিহাস এই যে, ইউরোপিয়ান বিজয়ী জাতিগুলি এই দাস জাতির শিক্ষাব্যবস্থা অধ্যয়ন ও পরীক্ষা করে দেখতে পেলো যে, এই জাতিটিকে দাসত্বের শিকলে চিরদিন আবদ্ধ করে রাখার জন্য যে রকমের শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি ও প্রচলন করা দরকার তা করতে তাদের খুব বেশি পরিশ্রম করতে হবে না। কারণ এই জাতির ফুকাহা, মোফাস্সের, মোহাদ্দিস ও মুফতি এক কথায় পণ্ডিতরা ইতোপূর্বেই সে জন্য অতি সুন্দরক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছেন। তারা জাতির একটি অংশকে যা শেখাচ্ছিলেন তাতে জাতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে কিছু নেই, যা আছে তা ভুল। এবং প্রচুর পরিমাণে আছে ছোটখাটো খুঁটিনাটির অবিশ্বাস্য চুলচেরা বিশ্লেষণ, তাই নিয়ে বহুবিধ মতভেদ ও ঝগড়া। এই অধ্যয়নের ফলে তারা এটাও বুঝতে পারলো কেন এই জাতিটি জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিতে পৃথিবীর শিক্ষকের আসন থেকে এতো অল্প সময়ের মধ্যে একটি অশিক্ষিত মূর্খ জাতিতে পর্যবসিত হয়েছে। তারা আরও দেখলো যে, ঐ বিশ্লেষণকারী পণ্ডিতদের এবং সুফীদের শিক্ষার ফলে এই জাতির যে সামরিক শিক্ষা ও প্রেরণা ছিল তা সম্পূর্ণভাবে চাপা পড়ে গেছে বা একেবারে বাদ পড়ে গেছে।

সুতরাং ইউরোপিয়ান প্রভুরা এই দাস জাতির পণ্ডিতদের প্রস্তুত ক্ষেত্রের উপরই এক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুললো- এই শিক্ষায় জাতিটি আগের চেয়েও বেশি চুলচেরা বিশ্লেষণে ব্যাপৃত হয়, আরও ফেরকায় বিভক্ত হয়ে মারামারি করে, আরও অন্তর্মুখী হয় এবং প্রভুরা আরও নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হয়ে প্রভুত্ব ও শোষণ করতে পারে। এই সময়ের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে মনে হয় বিভিন্ন ইউরোপিয়ান শক্তিগুলি একত্রে মিলিত হয়ে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কারণ মরক্কো থেকে বোর্নিও পর্যন্ত প্রায় সম্পূর্ণ 'মুসলিম' জগত অধিকার করেছিল ইউরোপের ছোট বড় বিভিন্ন জাতিগুলি এবং সকলেই একই রকমের পদক্ষেপ নিয়েছিল। সেটা হলো এই যে, প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ গোলাম জাতির মধ্যে দু'রকম শিক্ষা পদ্ধতি চালু করলো। একটা হলো তাদের নিজেদের যার যার দেশে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি। এটা চালু করতে তারা খানিকটা বাধ্যও হলো। কারণ তারা যে বিরাট ভূভাগ ও জনসংখ্যা অধিকার করেছিল তা ভালোভাবে শাসন করতে যে পরিমাণ মানুষ দরকার তাদের দেশগুলি থেকে অত মানুষ আনা কার্যত সম্ভব ছিল না, দেশীয় লোকজনের সাহায্য অপরিহার্য ছিল। তাছাড়া তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত হলে দেশে তাদের অনুগত একটি শ্রেণি সৃষ্টি হবে এ উদ্দেশ্যও ছিল। তবে ঐ শিক্ষাব্যবস্থায় একটা ব্যাপারে বিদেশি প্রভুরা সর্বত্র সতর্ক থেকেছে যে, তাদের নিজেদের দেশে শিক্ষাব্যবস্থায় যে নিজের জাতির প্রতি ভালোবাসা, আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা গড়ে ওঠে এদের বেলায় যেন তা না হয় বরং তারা যেন নিজেদের পরিচয় না পায়। তাদের অতীত ও বর্তমান সম্বন্ধে যেন অবজ্ঞা ও ঘৃণা সৃষ্টি হয় এবং প্রভুদের সম্বন্ধে যেন তারা হীনমন্যতায় ডুবে থাকে। এই শিক্ষাব্যবস্থায় তারা পাঠ্যবস্তু পাঠ্যক্রম (Curriculum) এমনভাবে তৈরি করলো যাতে এই জাতির ইতিহাসের বদলে ইউরোপের বিভিন্ন জাতিগুলির ইতিহাস স্থান পেলো। বিজ্ঞানের যে ভিত্তি মুসলিম জাতি স্থাপন করেছিল, যে ভিত্তির উপর পরে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন জাতিগুলি যে উন্নতি করেছিল তা লুপ্ত করে দিয়ে, মুসলিম আবিষ্কারকদের নাম বাদ দিয়ে নিজেদের নাম বসিয়ে তারা শিক্ষার্থীরের মনে বিশ্বাস জন্মিয়ে দিলো যে, জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রবর্তক, প্রচলক শুধু তারাই। প্রাচ্যের জাতিগুলির ধর্ম, বিশ্বাস, কুসংস্কার, মানুষগুলি পশু পর্যায়ের। সামরিক দিক দিয়ে তারা এই দাস জাতির ছাত্র-ছাত্রীদের শেখালো যে, হ্যানিবল, সিজার আর নেপোলিয়নের মত বিজয়ী সেনাপতি ইতিহাসে আর হয় নি। ছাত্র-ছাত্রীরাও তাই শিখলো ও বিশ্বাস করলো। তারা জানলো না যে পৃথিবীর ইতিহাসে চির অপরাজিত অর্থাৎ জীবনে কোন যুদ্ধেই হারেননি এমন সেনাপতি হয়ে গেছেন মাত্র পাঁচ জন, এবং এই পাঁচজনই প্রাচ্যের। এই পাঁচ জন হচ্ছেন শেষ নবী মোহাম্মদ (দ:) বিন আব্দাল্লাহ, আল্লাহর তলোয়ার খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা:), স্পেনের খলিফা আবদুর রহমান, সুলতান মাহমুদ এবং চেঙ্গিস খান। এবং এই পাঁচ জনের মধ্যে চারজনই মুসলিম। পাশ্চাত্যের কিছু কিছু ইতিহাসবিদ ওহোদের যুদ্ধে বিশ্বনবীকে (দ:) পরাজিত বলে দেখাতে চেষ্টা করেছেন তাদের চিরাচরিত অভ্যাস মোতাবেক তাঁকে ছোট করার জন্য। কিন্তু ঐ যুদ্ধে তাঁর পরাজয় হয়নি। বিপর্যয় হয়েছিল, তিনি গুরুতর আহত হয়েছিলেন, কিন্তু পরাজিত হননি। প্রকৃতপক্ষে মুসলিমদের একটা শিক্ষা দেবার জন্যই আল্লাহ ঐ ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। সে শিক্ষা হলো এই যে, নেতার বা সেনাপতির আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন না করলে কী হয়। খুব বেশি বললে ওহোদ যুদ্ধের ফলাফল কে সমান সমান অর্থাৎ অচলাবস্থা (Stalemate) বলা যায়। বদর, ওহোদ বা খন্দক; এর যে কোন একটি যুদ্ধেই যদি মহানবী (দ:) পরাজিত হতেন তবে ঐখানেই ইসলামের সমাপ্তি ঘটতো। স্বসৈন্যে আল্পস পর্বত অতিক্রম করেছিলেন বলে নেপোলিয়ানকে অসম্ভব সম্ভবকারী মানুষ বলে শেখানো হলো এবং এই দুর্ভাগ্য জাতির ছেলেমেয়েরা তাই শিখলো এবং বিশ্বাস করলো। তারা জানলোও না যে এর চেয়েও শতগুণ অসম্ভব কাজ করেছিলেন তাদের জাতিরই একজন। ইস্তাম্বুল জয় করার যুদ্ধে সুলতান দ্বিতীয় মোহাম্মদ তার সম্পূর্ণ নৌবহরকে পাহাড়ের উপর দিয়ে টেনে অতিক্রম করেছিলেন।

এই শিক্ষাব্যবস্থায় এই দাস জাতির যুব সম্প্রদায়ের মন মানসিকতায় হীনমন্যতা ঢুকিয়ে দিতে আরেক ব্যবস্থা নেওয়া হলো। সেটা হলো শিক্ষার মাধ্যম করা হলো বিভিন্ন বিজয়ী প্রভুদের ভাষা। একদা অর্ধেক পৃথিবী বিজয়ী এই জাতিটাকে সামরিকভাবে পরাস্ত করে তাকে খণ্ড খণ্ড করে ভাগ করে নিয়ে ইউরোপিয়ান জাতিগুলি যার ভাগে যে ভাগ পড়েছিল সে ভাগে নিজেদের ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করলো। হীনমন্যতায় আপ্লুত করা ছাড়াও আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল আরবি ভাষা থেকে এদের বিচ্ছিন্ন করা, কারণ গোলামে পরিণত হবার আগে সর্বত্র এই জাতির শিক্ষার মাধ্যম ছিল আরবি, যার ফলে বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলেও সবারই একটা সাধারণ ভাষা (Lingua Franca) হিসাবে আরবি একটা ঐক্যসূত্র হিসাবে কাজ করছিল। ঐ ঐক্যসূত্র কেটে দেওয়াও ছিল শিক্ষার মাধ্যম পরিবর্তন করার উদ্দেশ্য। কিন্তু নিজেদের ইউরোপিয়ান ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করলেও প্রভুরা পাঠ্যবস্তু এমনভাবে নির্ধারণ করলো যাতে এরা পাশ্চাত্যের বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার্থীদের মত প্রকৃত শিক্ষা না পায়, কিন্তু শুধু প্রভুদের পক্ষ হয়ে তাদের প্রশাসন চালাতে সাহায্য করতে পারে। এটুকু করার জন্য যতটুকু অংক, ভূগোল, বিজ্ঞান ও বিকৃত ইতিহাস শিক্ষা দরকার শুধু ততটুকুই করার ব্যবস্থা রইলো। এক কথায় ঐ শিক্ষায় সৃষ্টি হলো একটা কেরানিকূল, যারা মাঝারি ও নিম্ন পর্যায়ের ঔপনিবেশিক প্রশাসন চালিয়ে যেতে পারে। এই শিক্ষার মাধ্যমে সৃষ্টি 'শিক্ষিত' শ্রেণিটাই ইউরোপিয়ান প্রভুদের পক্ষ হয়ে অতি বিশ্বস্তভাবে প্রশাসন চালিয়েছে। এমন সতর্কতার সাথে এই শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালন করা হলো যে, এক পুরুষেরও কম সময়ে বিভিন্ন অধিকৃত দেশে একটি শ্রেণি সৃষ্টি হলো যারা লেখাপড়া জানে কিন্তু হীনমন্যতায় এমন পর্যায়ে নেমে গেছে যে পাশ্চাত্য প্রভুরা লাথি মারলে নিজে কতখানি ব্যথা পেয়েছে সেটা বোধ করার আগে প্রভুর পায়ে আঘাত লাগলো কিনা সেই চিন্তা করেছে। এই শ্রেণিটি ইউরোপিয়ান প্রভুদের পক্ষ হয়ে যার যার দেশে ঔপনেবেশিক শাসনের মধ্য ও নিম্ন পর্যায়ের প্রশাসন চালিয়েছে, কোথাও প্রভুদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান হলে তাকে দমন করেছে, প্রভুদের আদেশে নিজেদের জাতির লোকের বুকে গুলি চালিয়েছে, তাদের জন্য নিজের জাতির বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করেছে। এই শিক্ষিত শ্রেণিটি চলাফেরায়, কথা বার্তায়, পোশাক পরিচ্ছদে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে তাদের প্রভুদের অনুকরণের। ঐ শিক্ষাব্যবস্থার ফলে এই দাস জাতির মধ্যেই একটা অংশ বিজাতীয় হয়ে গজালো যাদের মন মগজে দাসত্ব ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

পাশ্চাত্য প্রভুরা গোলাম জাতিগুলোকে মানাসিকভাবে সত্যিকার বিশ্বস্ত দাস বানানোর পরও নিশ্চিত হলো না। কারণ জাতির অনেক বৃহত্তর অংশ তাদের ঐ শিক্ষার প্রভাবের বাইরে ছিল। যখন সামরিকভাবে যুদ্ধে পরাজিত করে এই বিরাট জাতিটাকে তারা দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিল তখন এই জাতির মধ্যে হাজার হাজার বিদ্যালয়, বহু বিশ্ববিদ্যালয় ও তাতে কোটি কোটি ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করতো। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সেখানে ছিল না সে কথা বলার অপেক্ষা করে না। কারণ তা থাকলে তো আর তাদের পাশ্চাত্যের দাসে পরিণত হবার প্রশ্নই আসে না। ইসলামের পণ্ডিতদের কার্যের ফলে ঐ শিক্ষা বহু পূর্বেই এই দীনের আদেশ নিষেধের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং ঐ বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ঐ ক্ষতিকর বিষয়গুলিই শিক্ষা দেয়া হতো, যার ফলে জ্ঞান বিজ্ঞানের সুউচ্চ আসন থেকে জাতি এর আগেই মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য প্রভুরা নিশ্চিন্ত হতে পারলো না। দাস জাতির এই বৃহত্তর অংশ থেকে নিরাপদ হবার জন্য তারা যেসব পদক্ষেপ নিলো তা হচ্ছে এই:

ক) প্রথমে তারা এই জাতির তখন বিদ্যমান বিদ্যালয়গুলি, যেগুলির নাম ছিল মাদ্রাসা, তা ধ্বংস করে দিলো। এই ধ্বংস তারা করলো কয়েকটি উপায়ে, বেছে বেছে কতকগুলি বন্ধ করে দিলো, কতকগুলিকে সর্বরকম সাহায্য

বন্ধ করে দিয়ে স্বাভাবিক মৃত্যুর মধ্যে ফেলে দিলো। বিভিন্ন ইউরোপিয়ান জাতিগুলি বিভিন্ন 'মুসলিম' দেশগুলিতে কেমন করে তাদের নিজস্ব ধারার শিক্ষা যা আরবির মাধ্যমে ছিল তা ধ্বংস করে দিয়েছিল তার বিস্তৃত বিবরণে যেতে চাই না, কারণ বই বহু বড় হয়ে যাবে। শুধু এইটুকু হলেই আমাদের চলবে যে, কিছুদিনের মধ্যেই পরিস্থিতি এই দাঁড়ালো যে, এই জাতির একটি ক্ষুদ্র অংশ পরিবর্তিত হয়ে কালো এবং বাদামী ইউরোপিয়ানে পরিণত হল আর বাকি বৃহত্তর অংশ মূর্খ ও নিরক্ষর লোকসংখ্যায় পর্যবসিত হলো।

খ) এতেও নিজেদের নিরাপদ মনে না করে পাশ্চাত্য প্রভুরা ঐ বৃহত্তর অংশ থেকেও নিরাপদ হবার জন্য অন্য পদক্ষেপ নিলো। সেটা হলো- সেই আরবি মাধ্যমে নতুন করে মাদ্রাসা শিক্ষা চালু করা। কিন্তু তফাৎ এই যে, এই শিক্ষা এমন হওয়া যে, এই জাতি যেন কখনও তার প্রকৃত সত্ত্বা খুঁজে না পায়। পেছনে বলে এসেছি যে, এই কাজ করার জন্য অতি সুন্দর ভিত্তি আমাদের পণ্ডিতরা, ফকীহ ও মোফাস্সেররা তৈরি করে রেখেছিলেন। ঐ ভিত্তির উপর পাশ্চাত্য প্রভুদের আরবি শিক্ষিত (Orientalists) পণ্ডিতরা এই নতুন মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যবস্তু নির্ধারণ করলেন। করলেন অতি সতর্কতার সাথে। অতি সতর্কতার সাথে এই দীনের সামরিক দিকটা বাদ দেয়া হলো, জাতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মনে পড়তে পারে এমন সব কিছুকে ছেটে ফেলা হলো এবং অতি ছোট খাটো তুলনামূলক কম প্রয়োজনীয় ব্যাপার ও বিষয় দিয়ে নতুন পাঠ্যক্রম (Syllabus and Curriculum) তৈরি করা হলো। বিশেষভাবে স্থান দেয়া হলো অপ্রয়োজনীয় কিন্তু বিতর্কিত বিষয়গুলি। নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাতের, ফারায়েজের, বিবি তালাকের, কাপড়-চোপড়ের, দাড়ি-টুপির অবিশ্বাস্য ও চুল চেরা বিশ্লেষণ ও বিতর্কিত বিষয়ের বিচার। উদ্দেশ্য হলো এই শিক্ষায় শিক্ষিতরা যেন ঐ ছোটখাটো বিষয়বস্তুর মধ্যেই সীমিত থাকে, ওর উর্ধ্বে যেন উঠতে না পারে। ব্যক্তিগত ইবাদতের সূক্ষ্মতম প্রক্রিয়াও এ পাঠ্যবস্তু থেকে বাদ গেলো না, কিন্তু জাতীয় ব্যাপারের মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে কোণঠাসা করে দেয়া হলো, সম্ভব হলে একেবারে বাদ দেয়া হলো। এত কিছু করেও পাশ্চাত্য প্রভুরা নিশ্চিত হতে পারলো না।

এই জাতির কাছ থেকে তারা কী প্রচণ্ড মার খেয়েছিল তা তারা ভুলে যায়নি, তাদের ভয়ও যায় নি। তাই অতভাবে এই জাতিটাকে পদানত রাখার বন্দোবস্ত করেও নিশ্চিত হতে পারলো না। এই যে নতুন ব্যবস্থায় মাদ্রাসা শিক্ষা তারা চালু করলো এর পরিচালনার ভারও তারা প্রথম দিকে নিজেদের হাতে রাখলো, শুধু পাঠ্যবস্তু নির্ধারণ করে দিয়েই মুসলিমদের হাতে ছেড়ে দিলো না।

মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র তারা এই নীতি অবলম্বন করলো। আলজেরিয়া ও অন্যান্য উপনিবেশে ফ্রান্স; ট্রিপলী, লিবিয়া, ইটালী, মিশর, ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ; ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীনে ওলন্দাজ (ডাচ) এক কথায় সর্বত্র ইউরোপীয় শক্তিগুলি এই জাতিটাকে অন্ধ করে রাখার মোটামুটি একই পদ্ধতি কার্যকর করলো। সবগুলির বিবরণে না যেয়ে শুধু এই দেশের উদাহরণ সত্যান্বেষী মনের জন্য যথেষ্ট হবে মনে করি। এই নতুন ব্যবস্থায় এই উপমহাদেশে প্রথম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় কোলকাতায়, নাম আলীয়া মাদ্রাসা। প্রতিষ্ঠা করেন (১৭৮০) সনে গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস। এই আলীয়া মাদ্রাসার প্রথম অধ্যক্ষ (চৎরহপরঢ়ধষ) নিযুক্ত হন একজন ব্রিটিশ খ্রিস্টান, নাম ড. এ. স্প্রিঙ্গার এম. এ। তারপর একাদিক্রমে ২৭ জন খ্রিস্টান এই মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং তা করেছেন তারা ক্রমাগত ১৪৬ বছর (১৭৮০ থেকে ১৯২৬)। যে ২৬ জন খ্রিস্টান পণ্ডিত অধ্যক্ষ পদে থেকে কোলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় ৭৬ বছর ধরে মুসলিম দাবিদার ছাত্রদেরকে বিকৃত ইসলাম শিখিয়েছেন তাদের তালিকা:

১. এ.এইচ. স্প্রিংঙ্গার এম.এ. (১৮৫০)
২. উইলিয়াম ন্যাসলীজ এল.এল.ডি (১৮৭০)
৩. জে. স্যাটক্লিফ এম.এ. (১৮৭৩)
৪. এইচ. এফ. ব্রকম্যান এম.এ. (১৮৭৩)
৫. এ. ই. গাফ এম.এ. (১৮৭৮)
৬. এ. এফ. আর হোর্নেল [ঈ.ও.চ.ঐ.উ (১৮৮১)]
৭. এইচ প্রথেরো এম.এ. (অস্থায়ী) (১৮৯০)
৮. এ. এফ. হোর্নেল (১৮৯১)
৯. এফ. জে. রো এম.এ. (১৮৯১)
১০. এ. এফ. হোর্নেল (১৮৯২)
১১. এফ. জে. রো এম.এ. (১৮৯৫)
১২. এ. এফ. হোর্নেল (১৮৯৭)
১৩. এফ. জে. রো (১৮৯৮)
১৪. এফ. সি. হল (বি.এ.টি. এস.সি) (১৮৯৯)
১৫. স্যার অর‍্যাল স্টেইন পি.এইচ.ডি (১৮৯৯)
১৬. এইচ. এ. স্টার্ক বি.এ. (১৯০০)
১৭. লে. কর্ণেল জি.এস.এ. রেঙ্কিং (১৯০০)
১৮. এইচ. এ. স্টার্ক বি.এ. (১৯০১)
১৯. এডওয়ার্ড ডেনিসন রাস (১৯০৩)
২০. এইচ. ই. স্টেপেল্টন (১৯০৩)
২১. এডওয়ার্ড ডেনিসন রাস (১৯০৪)
২২. এম. চীফম্যান (১৯০৭)
২৩. এডওয়ার্ড ডেনিসন রাস (১৯০৮)
২৪. এ. এইচ. হারলি এম.এ. (১৯১১)
২৫. মি. জে. এম. ব্রটামলি বি.এ (১৯২৩)
২৬. এ. এইচ. হার্টি এম.এ. (১৯২৫)

[দেখুন- আলীয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, মূল- আঃ সাত্তার, অনুবাদ- মোস্তফা হারুন, ইসলামী ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এবং Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal by Dr. Sekander Ali Ibrahimy (Islamic Foundation Bangladesh)]।

এই খ্রিস্টান পণ্ডিতরাই ব্রিটিশ সরকারের নীতি অনুযায়ী ছাত্রদের কি শিক্ষা দেওয়া হবে তা নির্ধারণ করেছেন ও তা কার্যকর করেছেন। ঐ মাদ্রাসা থেকে যত আলেম, ফাজেল, কামেল ইত্যাদি বের হয়ে জাতির অন্য লোকদের ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে ইসলাম শিখিয়েছেন তারা সবাই 'ইসলাম' শিখেছেন খ্রিস্টান শিক্ষকদের কাছ থেকে। খ্রিস্টানরা কী 'ইসলাম' শিখেয়েছেন তা অনুমান করতে বেগ পেতে হয়না। একটু আগেই তা বলে এসেছি। কী নিদারুণ পরিহাস। একটা জাতির মধ্যে কতখানি বিকৃতি আসলে খ্রিস্টানদের কাছ থেকে ইসলাম শিখে পাস করে বের হয়ে এসে জোব্বা গায়ে দিয়ে, মাথায় পাগড়ি পড়ে, লম্বা দাড়ি ঝুলিয়ে বাকি অশিক্ষিত জাতির মধ্যে পৌরহিত্য করে সসম্মানে বাস করা যায়। এটা শুধু এদেশেই নয় 'মুসলিম' বিশ্বের সর্বত্র একই ইতিহাস। যাই হোক,

পাশ্চাত্য প্রভুরা এই মাদ্রাসাগুলির পরিচালনার ভার বহু বছর পর্যন্ত তাদের নিজেদের হাতেই রাখলো। তারপর যখন তারা নিশ্চিত হলো যে, আরবি ভাষার মাধ্যমে কোর'আন হাদিসের বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করেই শিক্ষা দিয়ে এদের এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে যে, অপ্রয়োজনীয়, বিতর্কিত মসলা-মাসায়েলের জালে এরা এমনভাবে পেঁচিয়ে গেছে ও বাকি অশিক্ষিত জাতিকে পেঁচিয়ে ফেলেছে যে আর তাদের ওর মধ্য থেকে ছুটবার আশংকা নেই, তখন তারা ঐ মাদ্রাসা পরিচালনার ভার 'মুসলিম' দের হাতে ছেড়ে দিলো এবং দিলো ঐ মাদ্রাসা ব্যবস্থায় শিক্ষিতদের হাতেই। কলকাতার আলীয়া মাদ্রাসার মত বহু মাদ্রাসা খ্রিস্টান প্রভুরা বিরাট 'মুসলিম' বিশ্বময় প্রতিষ্ঠা করে লক্ষ লক্ষ 'আলেম, ফাজেল, কামেল,' ইত্যাদি তৈরি করে সমাজের মধ্যে ছেড়ে দেয়। নিরক্ষর মূর্খ জনসাধারণ তাদের কাছ থেকেই 'ইসলাম' শেখে। প্রাথমিক ফকীহ, মোফাস্সেরদের দুর্ভাগ্যক্রমে সনাতন জীবনব্যবস্থা, সহজ সরল পথ ইসলামের সরলতার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়ে অতি বিশ্লেষণে যেয়ে সর্বনাশ করেছিলেন, কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষেই জ্ঞানী ও পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে খ্রিস্টান পণ্ডিতদের তত্ত্বাবধানে থেকে তাদের কাছ থেকে 'ইসলাম' শিখে এবার যে আলেম, ফাজেল শ্রেণিটি বের হয়ে এলো- এরা না ছিল জ্ঞানী, না ছিল পণ্ডিত। খ্রিস্টান শিক্ষকরা এদের যে শিক্ষা দিয়েছিল তাতে জাতীয় জীবনের কিছুমাত্র ছিল না, ছিল শুধু ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি মসলা মাসায়েল এবং বিশেষ করে যেগুলো পূর্ববর্তী মাযহাব ও ফেরকা সৃষ্টির কারণে বহুল বিতর্কিত। খ্রিস্টান শিক্ষকরা সতর্কতার সাথে ঐসব বিতর্কিত মসলা মাসায়েলের মধ্যেই এদের শিক্ষা সীমিত রেখেছিল এই উদ্দেশ্যে যে, এরা যেন ঐ বিতর্কিত মসলা মাসায়েলের তর্কাতর্কি ও মারামারিতে জীবন কাটিয়ে দেয়, জনসাধারণও যেন ইসলাম বলতে ব্যক্তিগত জীবনের ঐ খুঁটিনাটি মসলাকেই সম্পূর্ণ ইসলাম মনে করে এবং পাশ্চাত্য প্রভুদের জন্য কোন দুশ্চিন্তার কারণ না হয়।

এই পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়ন যে তাদের আশাতীত ফল দিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আজ পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বে যে মাদ্রাসা ব্যবস্থায় শিক্ষা চালু আছে তা ঐ খ্রিস্টান প্রভুদের তৈরি করা; যা থেকে অতি ক্ষুদ্র মন মগজ ও প্রায়ান্ধ দৃষ্টি নিয়ে এক পুরোহিত শ্রেণি বের হয়ে আসছে, যারা স্বল্প বেতনে মসজিদের এমাম, মোয়াজ্জিন হওয়া, মুরদা দাফন করা, মিলাদ পড়ানো ছাড়া জাতীয় আর কোন কাজের উপযুক্ত নয় এটাও প্রভুদের পরিকল্পনা মোতাবেকই। কারণ ঐ মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তারা অন্য কোন এমন শিক্ষা (Vocational) অন্তর্ভুক্ত করে নি, যাতে এরা উপার্জন করে খেতে পারে। উদ্দেশ্য হলো এরা যেন পুরোপুরি পুরোহিত শ্রেণিতে পরিণত হয় এবং ফলে জনসাধারণ আরও বেশি ঐ বিকৃত ব্যক্তিগত বিতর্কিত মসলা মাসায়েল শিখে তা নিয়ে ব্যাপৃত থাকে ও শাসকরা আরও নিশ্চিন্ত হতে পারে।

ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মোহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ আলীয়া মাদ্রাসাকে তার একটি লেখায় সুস্পষ্টভাবে "ব্রিটিশ ষড়যন্ত্রের ফসল এবং এর ইতিহাসকে মুসলিম জাতির পতনের ইতিহাস" বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "মুসলমানরা ছিল বীরের জাতি, ইংরেজ বেনিয়ারা ছলে-বলে-কৌশলে তাদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তাদের প্রচলিত ধর্ম, শিক্ষা, ও মর্যাদা হরণ করার জন্য পদে পদে যেসব ষড়যন্ত্র আরোপ করেছিল, আলিয়া মাদ্রাসা তারই একটি ফসল। বাহ্যত এই প্রতিষ্ঠানের পত্তন করা হয়েছিল আলাদা জাতি হিসাবে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্ত, যাতে মুসলমাদের ধর্ম, কৃষ্টি ও আদর্শ রক্ষা পায়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়াই ছিল তাদের আসল উদ্দেশ্য।"

মুসলিম জাতির হাত থেকে প্রশাসন বিভাগ হস্তান্তরিত করবার জন্য ব্রিটিশরা বিভিন্নপ্রকার ষড়যন্ত্র শুরু করে। অধ্যক্ষ সাহেব বলেন, "পূর্বে মাদ্রাসার শিক্ষিত ছাত্ররাই কাযী, এসেসর ও জজ ইত্যাদি পদে নিযুক্ত হতো। পরে তাও না হওয়ার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ধীরে ধীরে মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে দুর্বল করার ব্যাপারে সকল প্রচেষ্টা চালানো হয়। জীবিকার ক্ষেত্রে মাদ্রাসার ছাত্ররা যাতে একটা পথ খুঁজে পেতে পারে এজন্য আলিয়া মাদ্রাসাতে ইলমে ত্বিব (হেকিমি চিকিৎসাবিদ্যা) সিলেবাসভুক্ত করারও প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু ইংরেজ সরকার তা প্রত্যাখ্যান করেন। শেষাবধি শুধু ধর্ম শিক্ষার জন্যই এই মাদ্রাসা কোনো রকমে টিকে থাকে। এভাবে মুসলমানরা ধীরে ধীরো রাজ্যহারা, ধনহারা, মান-সম্মানহারা হয়ে এমন দরিদ্র জাতিতে পরিণত হয়, যা কোনোদিন তারা কল্পনা করতে পারে নি।" এভাবেই মুসলিম জাতির মধ্যে ধর্মব্যবসার ভিত স্থায়ীরূপ লাভ করে এবং খ্রিস্টানদের শেখানো ইসলামই সবার মনমগজে গেঁড়ে যায়। (আবদুস সাত্তার রচিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত 'আলীয়া মাদ্রাসার ইতিহাস' নামক গ্রন্থ থেকে)।

ইউরোপের খ্রীস্টানরা পৃথিবীর প্রায় সবক'টি মুসলিম দেশকে সামরিক শক্তিবলে অধিকার করার পর এই জাতিটি যাতে আর কোনদিন তাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য তারা বেশ কিছু সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করেছিল। তার একটি হচ্ছে- তারা শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে এ জাতিটিকে মানসিকভাবে তাদের অনুগত জাতিতে পরিণত করতে চাইলো। কারণ শিক্ষাব্যবস্থা হলো এমন এক মাধ্যম যা দ্বারা মানুষের চরিত্রকে যেমনভাবে ইচ্ছা তৈরি করা যায়। তাই দখলকারী শক্তিগুলি তাদের অধিকৃত মুসলিম দেশগুলিতে মাদ্রাসা শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষাও চালু করলো। ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থাটি তারা চালু করলো স্কুল কলেজের মাধ্যমে। এ ভাগটা তারা করলো এই জন্য যে, এ বিরাট এলাকা শাসন করতে যে জনশক্তি প্রয়োজন তা এদেশের মানুষ ছাড়া সম্ভব ছিল না; সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের কেরাণীর কাজে অংশ নিতে যে শিক্ষা প্রয়োজন তা দেওয়ার জন্য তারা এতে ইংরেজি ভাষা, সুদভিত্তিক অংক, বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক, ইতিহাস (প্রধানতঃ ইংল্যান্ড ও ইউরোপের রাজা-রানীদের ইতিহাস), ভূগোল, প্রযুক্তিবিদ্যা অর্থাৎ পার্থিব জীবনে যা যা প্রয়োজন হয় তা শেখানোর বন্দোবস্ত রাখলো; সেখানে আল্লাহ, রাসুল, আখেরাত ও দীন সম্বন্ধে প্রায় কিছুই রাখা হলো না, সেই সঙ্গে নৈতিকতা, মানবতা, আদর্শ, দেশপ্রেম ইত্যাদি শিক্ষাও সম্পূর্ণ বাদ রাখা হলো। তাদেরকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হলো যাতে তাদের মন শাসকদের প্রতি হীনমন্যতায় আপ্লুত থাকে এবং পাশাপাশি তাদের মন-মগজে আল্লাহ, রসুল, দীন সম্বন্ধে অপরিসীম অজ্ঞতাপ্রসূত বিদ্বেষ (A hostile attitude) সৃষ্টি হয়।

কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপিয়ান শক্তিগুলি এই তথাকথিত মুসলিম জগতের খণ্ড খণ্ড অংশগুলি শাসন ও শোষণ করার পর সময় এলো এদের চলে যাবার। মোটামুটি এই শতাব্দীর মাঝামাঝি ঐ খণ্ড খণ্ড অংশগুলিকে "স্বাধীনতা" দিয়ে ইউরোপিয়ান শক্তিগুলি প্রাচ্য থেকে চলে গেলো। এই চলে যাবার কারণ প্রধানত এই নয় যে, এই দাস জাতি তার দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে, সে আবার নিজেকে চিনতে পেরেছে এবং নিজের হারানো স্থান ফিরে পেতে বিদ্রোহ করেছে। অবশ্য বিদ্রোহ দু' এক জায়গায় যে হয়নি তা নয়, হয়েছে কিন্তু তা ভৌগোলিক স্বাধীনতার জন্য। আসল কারণ হলো ইউরোপিয়ান রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ করে এমন ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্বল হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের আর এশিয়া আফ্রিকাময় বিরাট উপনিবেশগুলিকে ধরে রাখার মত শক্তি ছিল না। কিন্তু ইচ্ছা করলে তারা ঐ দুর্বল শক্তি নিয়েও আরও কিছুকাল তাদের অধিকৃত দেশগুলিকে অধীন রাখতে পারতো। কিন্তু তা করতে গেলে তাদের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন খুব ক্ষতিগ্রস্ত হতো। তাই তারা বুদ্ধিমানের মত ভালো সম্পর্ক বজায় রেখে আলোচনার মাধ্যমে এই পরাধীন দাস জাতিগুলিকে আপাত স্বাধীনতা দিয়ে ইউরোপে ফিরে গেলো।

উপনিবেশগুলিকে ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেবার পর ইউরোপিয়ান প্রভুরা চিন্তা করলো ক্ষমতা কাদের হাতে ছেড়ে যাবে? অবশ্য সিদ্ধান্ত নিতে বেশি কষ্ট হয়নি, কারণ ভবিষ্যতে কোন্ শ্রেণি তাদের দ্বারা প্রভাবিত হবে, তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করবে, এবং তাদের খুশি রাখতে চেষ্টা করবে তা অতি পরিষ্কার। কাজেই যাবার সময় তারা ক্ষমতা ছেড়ে গেলো ঐ শ্রেণিটির হাতে, যাদের তারা এতদিন তাদের ভাষার মাধ্যমে, তাদের তৈরি পাঠ্য বিষয়বস্তু শিক্ষা দিয়ে তাদের নিজ জাতির মন মানসিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের বিশ্বস্ত দাসে পরিণত করেছিল। অবশ্য অন্য কোন শ্রেণির হাতে ক্ষমতা দেয়াও যেতোনা, কারণ ইউরোপিয়ান প্রভুদের সৃষ্ট 'ঐ শিক্ষিত' শ্রেণিটি বাইরে ছিল আর দু'টি মাত্র শ্রেণি। সে দুটির একটি হলো তাদেরই মাদ্রাসায় 'শিক্ষিত' পুরোহিত শ্রেণি, অন্যটি নিরক্ষর ও অশিক্ষিত জনসাধারণ। পুরোহিত শ্রেণিটি মসলা মাসায়েল ছাড়া আর কিছুই জানতো না, রাষ্ট্র পরিচালনা তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল, আর নিরক্ষর অশিক্ষিতদের হাতে শাসনভার দেয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই ক্ষমতা হাতে এলো কালো ফরাসী, বাদামী ইংরেজ, হলদে ওলন্দাজদের হাতে। আগেই বলে এসেছি এরা প্রভুদের শিক্ষার গুণে চামড়ার রং বাদে আর সব দিক দিয়ে ইউরোপিয়ান। নিজেদের ইতিহাস, জীবন ব্যবস্থা (দীন), সভ্যতা, কৃষ্টি সব কিছু থেকেই এরা ছিল বিচ্ছিন্ন- শুধু বিচ্ছিন্ন নয় বিরোধী, বিগত প্রভুদের সম্বন্ধে গভীর হীনমন্যতায় আপ্লুত। ক্ষমতাপ্রাপ্ত এই শ্রেণির আশা আকাক্সক্ষার সঙ্গে তাদের নিজ নিজ জাতির আশা আকাক্সক্ষার কোন মিল ছিল না, এমন কি বহু ক্ষেত্রে ও বিষয়ে ছিল বিরোধী। আন্দোলন ও সংগ্রামের ফল হিসাবে যে সব দেশে স্বাধীনতা এসেছে সেসব দেশে মুখ্যতঃ জনসাধারণের প্রচেষ্টার ফলেই এসেছে, কিন্তু ক্ষমতা এসেছে ঐ দাসত্বপ্রবণ 'শিক্ষিত' শ্রেণিটির হাতে।

এই ক্ষমতার হাত পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী ফল এই হলো যে, নতুন শাসকরা এতদিন পর স্বাধীন হয়ে তাদের জীবন ব্যবস্থা- যেটাকে বিদেশি প্রভুরা বিসর্জন দিয়েছিল, সেটাকে আবার জাতীয় জীবনে পুনর্বাসন করলো না। তারা পূর্ব প্রভুদের চালু করা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, দণ্ডবিধি এমনকি শিক্ষাব্যবস্থা পর্যন্ত ঠিক যা ছিল তাই রাখলো এবং তাদের নিজ নিজ জাতির জীবনে চাপালো। এই নতুন শাসক শ্রেণির কাছে ইউরোপিয়ানদের সৃষ্ট ব্যবস্থার চেয়ে ভালো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইন-কানুন সম্ভব ছিল না। আল্লাহর দেয়া আইন-কানুন তাদের কাছে চৌদ্দশ' বছরের পুরানো সুতরাং পরিত্যাজ্য। এই অপরিসীম হীনমন্যতার ফল এই হলো যে, জেলখানার দরজা খুলে দিয়ে পুলিশ চলে গেলেও কয়েদীরা জেলখানাতেই বাস করতে লাগলো এবং জেল পুলিশ তাদের বেত মেরে, চাবুক মেরে, ঘাড় ধরে যে কাজ কর্ম করাতো তারা নিজেরাই তা রুটিন মাফিক করতে থাকলো। শুধু তফাতের মধ্যে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে কিছু লোককে তারা নির্বাচিত করলো চলে যাওয়া পুলিশ প্রভুদের স্থান পূরণের জন্য। এই নতুন পুলিশ পূর্বতন পুলিশদের মতই বেত মারে, ঘাড় ধরে তাদের আগের মতই দৈনন্দিন কাজ কর্ম করাতে থাকলো। তারা কয়েদীদের বোঝালো যে, আগের পুলিশ চলে গেছে, আমরা স্বাধীন হয়েছি, কিন্তু আমরা এখানেই থাকবো এবং যেভাবে এতদিন চলেছি ওমনিই চলবো; কারণ এটাই ভালো, এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আর হতে পারে না। সাধারণ অশিক্ষিত কয়েদীরা অধিকাংশই তাদের কথা বিশ্বাস করলো এই জন্য যে, তারা যখন স্বাধীন ছিল সে সময়ের কথা তারা ততদিনে ভুলে গেছে। তাদের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে তখন লজ্জাকর অজ্ঞতা। জেলখানার বাইরে যে আল্লাহর উন্মুক্ত দুনিয়া রয়েছে তা তাদের জানতে দেয়া হয় নি। আমরা এখনও আমাদের পূর্ব প্রভুদের জেলখানাতেই আছি- শুধু শারীরিকভাবে সেই পুলিশ নেই- তাদের ওয়ার্ডাররা (Warder) আছে, তারাই এখনও আমাদের নিয়ন্ত্রণ ও শাসন করছে।

ব্রিটিশ শিক্ষায় শিক্ষিতদের দাস মনোবৃত্তি

ইংরেজরা ভারতবর্ষে তাদের শাসনকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলো প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৭ সনের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্যর্থ করে দেওয়ার পর। এর আগে যদিও তারা প্রায় একশ বছর শাসন করেছে কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে তারা সম্ভবত একদিনও সুস্থির হয়ে বসতে পারেনি। কারণ ভারতজুড়ে এই সময়ের মধ্যে প্রধানত মুসলিমদের নেতৃত্বে শত শতবার বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে। এই বিদ্রোহগুলিতে মুসলিমরা নেতৃত্ব দিলেও অসংখ্য হিন্দু ধর্মাবলম্বীও জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। তবে মুসলিম জনসংখ্যাটির একটি বিরাট অংশ এই বিদ্রোহগুলিতে অংশ নেওয়ার পেছনে ইসলামের সংগ্রামী চেতনা প্রচণ্ডরূপে ক্রিয়াশীল ছিল। পাশাপাশি ভৌগোলিক স্বাধীনতা, অত্যাচারী ইংরেজ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধস্পৃহা, শাসনক্ষমতা পুনরুদ্ধারের প্রবল আকাঙ্ক্ষা সবকিছুই তাদেরকে সাংঘাতিক বিপদ্‌জনক এই বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহ যুগিয়েছিল। তারা কোন অবস্থাতেই খ্রিস্টানদের শাসন মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। ইংরেজরা এই দেশে আগমনের পর থেকেই এদঞ্চলের অধিবাসী হিন্দু ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা, ধর্মানুভূতি, সংস্কার ও কুসংস্কার, অতীত ও বর্তমান অর্থাৎ সমস্তকিছু পুংখানুপুংখভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে যাচ্ছিল এবং সেই মোতাবেক সতর্কতার সঙ্গে ভারতে নিজেদের শাসননীতি নির্ধারণ করেছিল এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিল। এটি ছিল একটি চলমান প্রকৃয়া। এই দীর্ঘ ২০০ বছরের শাসন-শোষণ এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইতিহাস বর্ণনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, এ সম্পর্কে শত শত গবেষণাগ্রন্থ, ইতিহাসগ্রন্থ, আত্মজীবনী বহুকিছু রচনা হয়েছে। আমরা আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করছি শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি অর্থাৎ এর উদ্দেশ্য, প্রক্রিয়া আর ফলাফলের দিকে। হিন্দু-মুসলিমসমেত ভারতবর্ষকে দাসে পরিণত করার পর তাদেরকে নিরাপদে শাসন ও শোষণ করার জন্য যে ষড়যন্ত্রমূলক নীতিগুলি গ্রহণ করেছিল সেগুলির মধ্যে যেগুলি প্রধান:

১) শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে দেশীয় জনগণের মধ্যে মূল জনগোষ্ঠী থেকে চিন্তা চেতনায় পৃথক একটি প্রভুভক্ত কেরানি শ্রেণি সৃষ্টি করা।

২) শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে জাতির ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়া এবং বিকৃত ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া।

৩) ভাগ করে শাসন করো (Divide and Rule) নীতি অবলম্বন করে ভারতে বিরাজিত জাতিগুলিকে ধর্ম, অঞ্চল, বর্ণাশ্রম ইত্যাদি পার্থক্যগুলিকে বহুমুখী প্রচারের মাধ্যমে জাগিয়ে দেওয়া। উল্লেখ্য, হিন্দুদের বর্ণভেদ প্রথাকে ব্রিটিশরা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য তাদের পরিচালিত আদমশুমারীতে নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরকে 'অস্পৃশ্য' শিরোনামে লিপিবদ্ধ করেছিল। (British Rulers inflamed the differences, that were already existent in the society because of the diverse backgrounds of its people. They established their Empire in India by playing off one part against the other.)

৪) পূর্বতন শাসক শ্রেণি, অভিজাত পরিবারগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়া, জাতীয় গৌরবের বিষয়গুলি বিলুপ্ত করা এবং নতুন অভিজাত মধ্যবিত্ত শ্রেণি সৃষ্টি করা যারা ব্রিটিশদের তাবেদারী করবে।

৫) ভারতের দাপ্তরিক ভাষা হিসাবে প্রচলিত ফারসি ভাষাকে পরিবর্তন করে সেখানে ইংরেজি চালু করা। এর মাধ্যমে সরকারি কাজে নিয়োজিত উচ্চপদস্থ মুসলিমরা একেবারে বেকার জনসংখ্যায় পরিণত হয়।

৬) পশ্চিমা মতবাদের ভিত্তিতে হিন্দু, মুসলিমদের জন্য পৃথক রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করা।

এই কাজগুলি করার ক্ষেত্রে ব্রিটিশরা তাদের প্রবর্তিত "Modern Education System"- এর মাধ্যমে সৃষ্ট তথাকথিত শিক্ষিত শ্রেণিকে পুরোমাত্রায় ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। কীভাবে ব্যবহার করেছে সেটা আমরা ইতিহাসের পাতা থেকে এ অধ্যায়ে কিছু কিছু দেখাতে চেষ্টা করবো।

প্রথমেই আসি তারা কী উদ্দেশ্যে এই শ্রেণিটি তৈরি করেছিল সে প্রসঙ্গে ইতিহাস কি বলে?

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতায় শিকড় গেঁড়ে বসার পর থেকে তাদের সরকার, মুতসুদ্দি, দালালের কাজ করে কিছু দিশি লোক জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে। তারপর কোম্পানি ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে বাংলার নবাবকে পরাজিত করে ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশ ও ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিষ্ঠা করে। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দখলদারি পাওয়ার পর এই উপনিবেশের পরিধি দ্রুত বিস্তৃত হতে থাকে। কলকাতা হয় ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী। দলে দলে ভাগ্যান্বেষী 'কলিকাতা কমলালয়ে' এসে হাজির হল। ঔপনিবেশক সাহেবদের অধীনে কাজ করতে গেলে এক আধটু সাহেবদের বুলি বোঝা দরকার, উচ্চাকাঙ্ক্ষীরা দু'চারটে ইংরেজি বকুনি আউড়াতে শিখে সাহেবদের নেক নজরে পড়ল আর বেশ দু'পয়সা কামিয়ে দিশি সমাজে কেউকেটা বনে গেল। দিশি সমাজে ইংরেজি শেখার চাহিদা দেখা দিল। সেই চাহিদা মেটানোর জন্য প্রথমে কিছু ব্যক্তি ইংরেজি পাঠশালা খুলল। ১৭৯১ সালে জোনাথান ডানকান বারাণসীতে একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০০ সালে লর্ড ওয়েলেসলি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্রিটিশ কর্মচারীদের এদেশে প্রচলিত ভাষাগুলি অর্থাৎ বাংলা, ফার্সি, উর্দু ইত্যাদি শেখানোর উদ্দেশ্য নিয়ে কলকাতায় চালু করেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। ১৮১৩ সালের চার্টার আইনে ভারতে 'শিক্ষাবিস্তারে' ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিকল্পনা উল্লেখ করা হয়। ১৮১৭ সালে ডেভিড হেয়ার কলকাতা হিন্দু স্কুল (অধুনা প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়) স্থাপন করেন। ১৮৩০ সালের 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকার বিবরণ অবস্থাটা ¯পষ্ট করে:

হিন্দুকলেজাদি নানা পাঠশালা দ্বারা অনেক বিষয়ি লোকের সন্তানেরা ইঙ্গরেজী বিদ্যায় পারগ হইয়াছে, হইতেছে ও হইবেক। ইহারা কেহ দেওয়ানের পুত্র কেহ কেরানির ভাই কেহ খাজাঞ্চির ভ্রাতৃপুত্র কেহ গুদাম সরকারের পৌত্র কেহ নীলামের সেল-সরকারের সম্বন্ধী ইত্যাদি প্রায় বিষয়ি লোকের আত্মীয়। তাহাদিগকে কর্ম্মে উক্ত ব্যক্তিরা অবশ্যই নিযুক্ত করিয়া দিবেন এবং এই প্রথমতঃ কর্ম্ম হইয়া থাকে। (সমাচার চন্দ্রিকা, ১৫ চৈত্র ১২৩৬, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সঙ্কলিত ও সম্পাদিত): সংবাদপত্রে সেকালের কথা, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ.৭০-৭১)।

এই অবস্থায় ১৮৩৪ সালে টমাস ব্যাবিংটন মেকলের ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক ঔপনিবেশিক ভারতে আগমন। ভারতবর্ষের বিশাল উপনিবেশের শাসন-শোষণের প্রয়োজনে দিশি দালাল (Comprador), কর্মচারি (Subordinate) তৈরির জন্য ঔপনিবেশিক শিক্ষা সম্পর্কে মেকলে ১৮৩৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যে প্রস্তাবনা পেশ করেন সেটা পাঠ করলেই ব্রিটিশ চক্রান্তের গভীরতা সুস্পষ্ট বোঝা যায়। তিনি তার রিপোর্টে স্বল্পসংখ্যক ভারতীয়দের ইংরেজি-মাধ্যম যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রস্তাব করেন তার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলিমপ্রধান ভারতবাসীকে তাদের অতীত ঐতিহ্য ভুলিয়ে দিয়ে তাদেরকে একটি দাসমনোবৃত্তিসম্পন্ন হীনমন্য জাতিতে রূপান্তরিত করা এবং ব্রিটিশ রাজত্বের পতাকাকে এদেশের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক অঙ্গন থেকে মানুষের চিন্তা-চেতনার গভীরে নিয়ে প্রোথিত করা। আসুন দেখা যাক কী ছিল সেই প্রস্তাবনায়।

"I have travelled across the length and breadth of India and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber, that I do not think we would ever conquer this country, unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage, and, therefore, I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture and they will become what we want them, a truly dominated nation."

"অর্থাৎ আমি ভারতের এ মাথা থেকে ও মাথা ঘুরে বেড়িয়েছি কিন্তু একটি ভিক্ষুকও আমার চোখে পড়েনি, একটি চোরও আমি দেখতে পাইনি। এ দেশে সম্পদের এত প্রাচুর্য এবং এদেশের মানুষগুলি এতটাই যোগ্যতাসম্পন্ন ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী যে এদেশকে আমরা কখনোই পদানত করতে পারবো না যদি না তাদের মেরুদণ্ডটি ভেঙ্গে ফেলতে পারি। এদেশের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যই হচ্ছে সেই মেরুদণ্ড। এ কারণে আমার প্রস্তাব হচ্ছে, আমরা এখানকার প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা, সংস্কৃতিকে এমন একটি শিক্ষা ও সংস্কৃতি দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যাতে প্রতিটি ভারতীয় নাগরিক ভাবতে শেখে যে, যা কিছু বিদেশি এবং ইংরেজদের তৈরি তা-ই ভালো এবং নিজেদের দেশের থেকে উৎকৃষ্টতর। এভাবে নিজেদের উপরে শ্রদ্ধা হারাবে, তাদের দেশজ সংস্কৃতি হারাবে এবং এমন একটি দাসজাতিতে (a truly dominated nation) পরিণত হবে ঠিক যেমনটি আমরা চাই।"

একটি জাতিকে নির্জীব, দাস, হতদরিদ্র বানিয়ে ফেলার কী নিষ্ঠুর ও অনৈতিক ষড়যন্ত্র! আজও সেই ষড়যন্ত্রের ঘানি টেনে বেড়াচ্ছে হিন্দু-মুসলামনসহ সমগ্র ভারতবাসী। শিক্ষার গোলামী, রাজনৈতিক গোলামী, অর্থনৈতিক গোলামী, সাংস্কৃতিক গোলামী আজ ব্রিটিশ যুগের চেয়ে শত শত গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এই জাতির বিশেষ করে ইংরেজদের তৈরি করা শিক্ষিত শ্রেণিটির কোন স্বপ্নও নেই। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ম্যাকলে ভারতের মানুষের চরিত্রের যে শক্তিশালী নৈতিক মেরুদণ্ড, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধ অর্থনীতির কথা লিখেছেন সেটা ভারতভূমি নিরবচ্ছিন্নভাবে সাতশত বছর মুসলিম শাসনে থাকার প্রত্যক্ষ ফল। যে শিক্ষিত গোলাম শ্রেণিটির চারিত্রিক রূপরেখা মেকলে অঙ্কন করেছেন তা দেখুন:

"We must at present do our best to form a class, who may be interpreters between us and millions of whom, we govern, a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, in opinion, in morals and in intellect".

"এই মুহূর্তে আমরা অবশ্যই এমন একটা শ্রেণি গড়ে তুলতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব যারা হবে যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে আমরা শাসন করি তাদের আর আমাদের মধ্যে দোভাষি, এমন একটা শ্রেণির মানুষ যারা হবে রক্তে আর গায়ের রঙে ভারতীয়, কিন্তু রুচি, মতামত, নৈতিকতা আর বিচারবুদ্ধিতে ইংরেজ।" (Thomas Babington Macaulay, Minute on the Indian Education 2 February 1835.)

অবশ্য কট্টর ইভ্যাঞ্জিলিস্ট খ্রিস্টান মেকলে ১৮৩৬ সালের ১২ই অক্টোবর কলকাতা থেকে তার বাবাকে লেখা একটি চিঠিতে এই প্রস্তাবের পরোক্ষ উদ্দেশ্য প্রকাশ করেন:

আমাদের ইংরেজি স্কুলগুলির দারুণ শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে। হিন্দুদের ওপর এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া বিরাট। ইংরেজি শিক্ষা পেয়েছে এমন কোনো হিন্দুই কখনোই তার ধর্মে আন্তরিকভাবে অনুরক্ত থাকতে পারে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা যদি অনুসরণ করা হয় তাহলে আজ থেকে তিরিশ বছর পরে বাংলাদেশের ভদ্রশ্রেণীর মানুষদের মধ্যে একজনও মূর্তি-উপাসক থাকবে না। আর ধর্মান্তরিত করার কোনো প্রয়াস ছাড়াই ব্যাপারটা সম্পন্ন হবে। (George Otto Trevelyan The Life and Letters of Lord Macaulay, New York, Harper & Brothers, Vol. II, p.398.)

সুতরাং বোঝা গেল, ভারতীয়দের ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত করে পাশ্চাত্য দর্শনে প্রভাবিত করাও ছিল এই 'আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার' উদ্দেশ্য যা বেশ ভালোভাবেই সফল হয়েছিল। ১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহের একটি বড় নেপথ্য কারণ ছিল মিশনারি তৎপরতার মাধ্যমে এবং শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে জোরপূর্বক ভারতবাসী মুসলিম ও হিন্দুদেরকে খ্রিস্টান বানিয়ে ফেলার চেষ্টা করা। আহমেদ ছফা লিখেছেন: তখন খ্রিস্টান ধর্মপ্রচার এত ব্যাপক হচ্ছিল যে, হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির সাধারণ মানুষ ও সৈন্যরা ক্ষেপে উঠেছিলেন। পাদ্রীরা হাট, ঘাট, বন্দর, হাসপাতাল ও স্কুল সর্বত্রই তাদের ধর্ম প্রচার করতে থাকে। প্রত্যেক স্কুলে বাইবেল শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। ছাত্রদের প্রশ্ন করা হত, 'তোমাদের প্রভু কে এবং কে তোমাদের মুক্তিদাতা?' ছাত্ররা শেখানো খ্রিস্টীয় পদ্ধতিতেই তার উত্তর দিত। (দ্র: সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস: আহমদ ছফা পৃষ্ঠা ১২, ১৩ ও ১৪)। হিন্দু কলেজ থেকে শিক্ষিতদের মধ্যে বড় একটি অংশ ধর্ম পরিবর্তন করে খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিল, মাইকেল মধুসুদন দত্তকে যাদের প্রতিনিধি হিসাবে ধরা যায়। আর অন্যরা খ্রিস্টান না হলেও হিন্দু ছিল না, হয় নাস্তিক, নয় সন্দেহবাদী, নতুবা ব্রিটিশদের তাবেদার ব্রাহ্মসমাজের সদস্য হয়ে গিয়েছিল। এদের মধ্যে 'কুসংস্কার ছেদনের উদ্দেশ্যে সুরাপান' ইত্যাদির ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিল।

১৮৩৫ সালে ইংরেজি ভাষাকে ভারতের উচ্চশিক্ষার একমাত্র মাধ্যম হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত হয় 'উড্স ডেসপ্যাচ অন এডুকেশন'। চার্লস উডের এই 'ডেসপ্যাচ'কেই ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষার ম্যাগনা কার্টা আখ্যা দেওয়া হয়। তিনিই প্রথম প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত শিক্ষার একটি যুক্তিসঙ্গত পাঠক্রম নথি আকারে প্রকাশ করেন। এই নথিতে প্রাথমিক স্তরে, মাধ্যমিক স্তরে এবং উচ্চশিক্ষা স্তরে কীভাবে কি পড়ানো হবে তার বিভাগ করে দেন তিনি। উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজি এবং প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্থানীয় ভাষাকে গ্রহণ করা হয়। ১৮৫০ সনে ইংরেজরা মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যেও একটি 'আধুনিক' শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণি তৈরি করার জন্য আলীগড়ে মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। এই কলেজের প্রিন্সিপালদের মধ্যে আর্কিবোল্ড, থিওডর বেক, মরিসন প্রমুখ প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতগণ মুসলিমদের মধ্যে পৃথক একটি শ্রেণি তৈরিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। এই মুসলিমরাও নিজেদেরকে অন্য মুসলিমদের থেকে আলাদা ভাবতে শেখে। ১৮৫৭ সালে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

পূর্বে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ভাষা হিসাবে ফারসী, আরবি ইত্যাদি ছিল এবং ভালোভাবে এর শিক্ষাসূচিতে নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। মূলত তা ছিল ধর্মভিত্তিক, এমনকি হিন্দুদের শিক্ষাব্যবস্থাও ছিল ধর্মভিত্তিক। তাই ইংরেজদের নৈতিকতাহীন শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণে মুসলমান জাতি কিছুতেই রাজী হয়নি, তবে এক সময় তারাও

ইংরেজি শিক্ষার দিকে ঝুঁকেছে এবং ইংরেজদের গোলামে পরিণত হয়েছে। এ ব্যাপারে উর্দু কবি আকবর ইলাহাবাদী (১৮৪৬-১৯২১) লিখেছেন-

আহবাব কেয়া নুমাযা কর গ্যায়ে

বি.এ. কিয়া, নওকর হুয়ে, পেনশন মিলি আরও মর গ্যায়ে।

অর্থাৎ, 'বন্ধুগণ কী কীর্তিই না করলেন। বি.এ. পাস করার পর ইংরেজের চাকর হলেন, চাকরির অবসানে পেনশন পেয়ে মৃত্যুবরণ করলেন।' মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন-বর্জিত এই শিক্ষাব্যবস্থার পরিণতি এ ছাড়া আর কি হতে পারে? এই ধর্মহীন, নৈতিকতাহীন ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে চরিত্রহীনতা ও ধ্বংস এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো।

যাই হোক ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ইংরেজদের অভিপ্রেত কিছু 'রুচি, মতামত, নৈতিকতা আর বিচারবুদ্ধিতে ইংরেজ' আর 'গায়ের রঙে ভারতীয়' তৈরি হল। কোটি কোটি ভারতীয়দের মধ্যে এরা সংখ্যায় নগণ্য। এদেরই একটা অংশ ইংরেজের বংশবদ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার বিশ্বস্ত কম্প্রাদরের (Comprador) ভূমিকা নেয়, আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যখন ভারতীয় উপমহাদেশে তথাকথিত 'স্বাধীনতার' নামে মার্কিনি নেতৃত্বে দলবদ্ধ পশ্চিমের নয়া-ঔপনিবেশিকতা কায়েম হল তখন থেকে সুবিধাভোগী পূর্বোক্ত কম্প্রাদরদের বংশধররা নয়া-কম্প্রাদরের ভূমিকা নিয়ে দেশের শাসন- শোষণ ব্যবস্থার কর্ণধার হয়ে বসল। এই সামান্য সংখ্যক সুবিধাভোগী দেশের সংখ্যাগুরু বিপুলসংখ্যক মানুষকে মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে ইংরেজি ভাষাকে শাসন-ব্যবস্থা, বিচার-ব্যবস্থা, উচ্চশিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, তথ্য-প্রযুক্তির ভাষা করে রাখল। এই অবস্থায় ইংরেজি না জানা এবং কম জানা বিপুলসংখ্যায় সংখ্যাগুরু বাংলাভাষীর অবস্থাটা করুণ। সরকারি কাগজপত্র, চিঠি, আইন-কানুন, পড়া, বোঝা, জানার, কোনো সমস্যায় আবেদন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত, ভোগ্যপণ্য বা ওষুধ কিনে তার নাম অথবা ব্যবহারের নিয়ম বোঝার ক্ষমতা তাদের নেই, বৈদ্যুতিক জগৎ তাদের আয়ত্তের বাইরে। অন্যদিকে ইংরেজি -নবিশ বাঙালিদের অবস্থাটা কী? এরা তোতাবৃত্তিতে বিভিন্ন বিদ্যায় পাশ্চাত্য-বাচন আউড়ায়। এদের অবদান, মৌলিক মনন, বিশ্লেষণ, সৃষ্টি, আবিষ্কার অতি নগণ্য। গত দু'শ বছরের ইতিহাস তাই প্রমাণ করে। সাম্প্রতিককালে যেসব ইংরেজি-নবিশ তোতাবৃত্তিতে নৈপুণ্য দেখিয়ে খ্যাতি লাভ করেন, ইংরেজিতে লেখেন পশ্চিমের নয়া-ঔপনিবেশক শক্তি বিদেশে চাকরি বা পুরস্কার দিয়ে তাদের পিঠ চাপড়ে দেয়।

ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিতরা যে নিজ দেশের স্বার্থ চিন্তা না করে ইংরেজ সরকারের স্বার্থ রক্ষা করে চলতো তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ তারা ইংরেজদের প্রতিটি শোষণমূলক পদক্ষেপ, দেশের শিল্প ধ্বংস, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ধানের বদলে নীল চাষ, বিলেতি পণ্যের বাজার সৃষ্টি, দেশের অর্থ ড্রেইন থিয়োরি মোতাবেক বিদেশে পাচারসহ সকলপ্রকার অন্যায় কাজের নৈতিক সমর্থন যুগিয়ে গেছে। এমনকি ১৮৫৭ সনের স্বাধীনতা সংগ্রামে যখন মুসলিমদের নেতৃত্বে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, এই শিক্ষিত শ্রেণিটি তখন স্বাধীনতার বিরুদ্ধে স্থান নিয়ে ইংরেজদের পক্ষে কাজ করেছিল।

সিপাহী বিপ্লবের পরে মুসলিমদের সংস্কৃতি সভ্যতা একরূপ ধ্বংস হয়ে গেল এবং ব্রিটিশদের পরিকল্পনামাফিক কলকাতা-কেন্দ্রিক হিন্দু সংস্কৃতি, সভ্যতা আরও বেশি জোরদার হয়ে উঠলো। যার ফলে হিন্দু-মুসলিম এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান গড়ে উঠতে থাকে; সৃষ্টি হতে থাকে পারস্পরিক অবিশ্বাস, ঘৃণা এবং সন্দেহের। এমন

নির্লজ্জভাবে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কলকাতা ব্যতীত আর কোথাও এ ধরনের সভা করে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের সমর্থন করা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

ইংরেজের সঙ্গে সহায়তা প্রসঙ্গে জনাব হুমায়ুন কবীর 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় (১৩৬৪ বঙ্গাব্দ) লিখেছেন: ইংরেজ ঐতিহাসিকরা বার বার উল্লেখ করেছেন, দেশের সর্বত্রই মধ্যবিত্ত সমাজ ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ইংরেজ রাজশক্তির সহায়তা করেছে।" Eighteen Fifty Seven- G Dr. S.N.Sen বলেছেন, কলিকাতার শিক্ষিত ভদ্র নাগরিকগণ এবং মাদ্রাজের ন্যায় বাংলার তাবৎ ভূমাধিকারী অভিজাত সম্প্রদায় এ বিদ্রোহের ও বিদ্রোহীদের প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করেছেন (পৃ: ৪০৮)। Autobiography of Debendranath Tagore -এ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, কলিকাতার নব্য সম্প্রদায়, যেটি পাশ্চাত্য প্রভাবজাত, সেদিন সে-সম্প্রদায় শুধু চুপ করে থাকেনি, সক্রিয়ভাবে ইংরেজ রাজশক্তির প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছে। -এ বক্তব্যের সমর্থনে প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের এ উক্তিটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য- "If we were to be asked what Government we would prefer English of any other, we would one and all reply: English by all means-even, in preference to the Hindu Government." [Daily Reformer. July,1931] অর্থাৎ আমাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, আমরা ইংরেজ অথবা অন্য সরকার-কাকে বেশি পছন্দ করি, তাহলে একবাক্যে বলব যে, সবরকমভাবে আমরা ইংরেজ সরকারকেই পছন্দ করি-এমনকি যদি হিন্দু সরকার হয় তার থেকেও।

কলমের কালি লেখককে শিল্পনিপুণতায় যেমন মানুষের ও দেশের কল্যাণ সাধন করতে পারে তেমনি কলমের অপব্যবহারে সমাজে সৃষ্টি হতে পারে বিদ্বেষ-বাষ্প, হিংসার হিংস্রতা ও সাম্প্রদায়িকতার তাণ্ডবলীলা। অখণ্ড ভারতবর্ষে যখন ইংরেজদের রাজত্ব তখন তাদের প্রয়োজন হয়েছিল একদল লেখক, কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, ঐতিহাসিক ও বিশ্বস্ত কর্মচারীর।

ইংরেজ জাতি তা সাফল্যের সঙ্গে সংগ্রহও করেছিল তাদের প্রতিষ্ঠিত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে আসা শিক্ষিত শ্রেণিটির মধ্য থেকে। কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের কলমের কালি কেমন করে হিন্দু-মোসলেমের মাঝে প্রাচীর তুলতে পারে, কেমন করে তারা প্রভু ইংরেজদের বন্দনা করতে পারে তা গভীরভাবে চিন্তার বিষয়। ইংরেজ অনুগত এই লেখকগোষ্ঠীর গুরু হিসাবে ধরা যেতে পারে শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে। ইংরেজ বিতাড়নে যখন মুসলিমরা উঠে পড়ে লেগেছেন তখন তিনি লিখলেন:

"চিরকাল হয় যেন ব্রিটিশের জয়!

ব্রিটিশের রাজলক্ষ্মী স্থির যেন রয়॥

ভারতের প্রিয়পুত্র হিন্দু সমুদয়।

মুক্তমুখে বল সবে ব্রিটিশের জয়॥

(দিল্লীর যুদ্ধ, গ্রন্থাবলী, পৃ: ১৯১)

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের লড়াই থেকে হিন্দু সম্প্রদায়কে কোন কায়দায় থামিয়ে রাখা হয়েছিল, এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় - কলমের যাদু। ব্যাপকভাবে যখন অমুসলমান জোয়ানরা আন্দোলনে যোগ দিলেন না, তখন স্বাভাবিকভাবেই

মুসলিম শাসকদের পরাজিত হতে হলো। ইংরেজদের পদানত হয়ে লুট ও লাঞ্ছিত হলো রাজধানী দিল্লী। ঠিক তখন ঈশ্বরচন্দ্র লিখলেন,

''ভয় নাই আর কিছু ভয় নাই আর।

শুভ সমাচার বড় শুভ সমাচার।

পুনর্বার হইয়াছে দিল্লী অধিকার।...

ইংরেজের রাগটা বেশির ভাগ গিয়ে পড়ল মুসলমানদের উপর। পরবর্তীকালে যিনি ফিল্ড মার্শাল লর্ড-রবার্টস হয়েছিলেন, সেই ক্যাপটেন রবার্টস লিখেছিলেন, 'বজ্জাত মুসলমানদের আচ্ছা করে দেখিয়ে দাও যে ঈশ্বরের কৃপায় ইংরেজই এ দেশের হর্তা-কর্তা-বিধাতা।' দোষী-নির্দোষীর কোন বাছ-বিচার ছিল না। সৈয়দ আহমদের মত নির্জলা ব্রিটিশ ভক্তের পরিবারও শাস্তির হাত থেকে রেহাই পায় নি। (জিএসআই গ্রাহাম লিখিত 'সৈয়দ আহমদ খান,' পৃ: ২৭-২৮)। কবি গালিবের একটি লেখাতে এই ভয়াবহ সন্ত্রস্ত আবহাওয়ার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়:

''শহর হো গৈ সাহারা। শহর মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। উর্দ্দু বাজার গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে। উর্দ্দু ভাষা আর বলবে কে? দিল্লী আর সে মহানগরী নেই, তার দুর্গ, তার শহর, তার দোকানপাট, তার ফোয়ারা- সব কিছুই গিয়েছে। হিন্দু মহাজনেরা আছে, কিন্তু ধনী মুসলমান আর নেই বললেই চলে। চেনাজানাদের মধ্যে এত লোককে হত্যা করা হয়েছে যে, আজ যদি আমার মৃত্যু ঘটে, শোকে চোখের জল ফেলবে এমন কেউ আর বড় নেই।''

সে সময় দিল্লীতে সবার মনেই যে বিপদ ও অনিশ্চয়তার ভয় বর্তমান ছিল, তার প্রমাণ মিলবে নিম্নোক্ত লেখাটিতে:

মুসলমানেরা শুধু যে বিদ্রোহের মধ্যেই বেশি অংশগ্রহণ এবং তার ফলে ব্রিটিশের হাতে বেশি নির্যাতন সহ্য করেছে তাই নয়, তারা অনেকদিন পর্যন্ত ব্রিটিশদের প্রতি বিরুদ্ধতা বজায় রেখেছে। নানাভাবে তারা এই ব্রিটিশ বিদ্বেষের পরিচয় দিয়েছে, নানা স্থানে গুপ্ত ষড়যন্ত্র চালিয়েছে। সিতানা ও পাটনায় এই ষড়যন্ত্রের প্রধান ঘাঁটি ছিল। মুসলমানেরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণেরও বিরোধিতা করেছে। তার ফলে ক্রমশ তারা ইংরেজের সরকারি চাকরি ও অর্থকরী বৃত্তি থেকে বিচ্যুত হয়েছে। হিন্দুরা ধীরে ধীরে পশ্চিমের শিক্ষা-সভ্যতা ও ভাবধারাকে গ্রহণ করেছে; কিন্তু মুসলমানেরা নিজেদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রাচীন বিশ্বাসকে আঁকড়ে রয়েছে দীর্ঘকাল। দিল্লীতে মুসলিম শাসনকালে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, বিদ্রোহের ফলে তা একেবারে মুছে গেল।

১৮৫৮ সালে ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকার জানুয়ারি-জুন সংখ্যায় জনৈক প্রবন্ধ লেখক লিখেছেন:

পাঁচ বছর আগে আমি দিল্লীতে গিয়েছিলাম, সেখানে মুসলিম পত্রিকার সংখ্যাধিক্য দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম। বিদ্রোহের পরে ব্রিটিশ যখন দিল্লী বিধ্বস্ত করল, তখন আর তার কিছুই অবশিষ্ট রইলো না। সংস্কৃতির কুসুম শুকিয়ে ধুলায় ঝরে পড়ল। 'জাকাউল্লা অব দিল্লী' গ্রন্থে সি এফ এন্ডরুজ লিখেছেন, ''বিদ্রোহের এক বছর পর পর্যন্ত দিল্লীর উপর দিয়ে যে মরণ-ঝঞ্ঝার তাণ্ডব গিয়েছে তাতে সংস্কৃতির আর লেশমাত্র অবশিষ্ট রইলো না। সে আঘাতের জের মুসলিম শিক্ষা আজও কাটিয়ে উঠতে পারেনি।''

অন্যদিকে হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুত্থানের পীঠ ছিল কলকাতায়। সেখানে বিদ্রোহের ঝড় বয়নি, 'তার রুধিরাক্ত বন্যার প্লাবন থেকে রক্ষা পেয়েছে, তার ধন-সম্পত্তি জনপ্রাণী রয়েছে অক্ষত, তার সংস্কৃতি রয়েছে অনাহত।

এর ফলেই হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা ব্যবধান গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। ব্যবধান অপ্রীতিকর, সন্দেহের এবং তিক্ততার। আজ ভারতবর্ষের জাতীয় জীবন যে সাম্প্রদায়িক কলহের দ্বারা কণ্টকিত তা সিপাহী-বিদ্রোহের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অবসান ঘটলো। অদৃষ্টের পরিহাস, ঠিক একই সময়ে ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গভূমি থেকে তৈমুর লঙ- এর বংশধরগণও (মোগল) অদৃশ্য হলেন চিরতরে। (আঠারো শ' সাতান্নর বিদ্রোহ : শ্রী অশোক মেহতা, পৃ: ৮১-৮৩)

দুঃখের বিষয় হলো, কলকাতাকেন্দ্রিক তাদের যে শিক্ষা তা সাম্প্রদায়িকতাকে বিশেষ করে মুসলমান বিদ্বেষকে কেন্দ্র করে বর্ধিত হয়ে উঠেছিল। এ কারণেই এই বিদ্বেষ ও বৈরিতা দানা বাঁধে ব্যাপক হারে। সাহিত্যের নানা বিভাগে ও অন্যান্য বিষয়ে এবং পত্র-পত্রিকায় নানা কায়দায় চলে মুসলমান বিদ্বেষ।

স্বদেশী মোগল সম্রাটদের তুচ্ছ ও তাচ্ছিল্যের ভাব দেখানো হয়। আর অকারণে ইংল্যান্ডের রাজা-রাণীর প্রশংসায় হয়ে ওঠে পঞ্চমুখ। জাতীয়তাবাদের শিক্ষাও তার মধ্যে ছিল সামান্য। ইংরেজি শিক্ষার পেছনে যে শক্তি ছিল, যা বল যোগাতো, তা হলো দাসত্ব করবার প্রেরণা ও বাসনা।

সাহিত্য এবং রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার বীজ প্রথম কলকাতাতে জন্মলাভ করে এবং তা পরিব্যাপ্ত হতে হতে আর কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, সে কথা ভাবলে যে কোন মানুষ ব্যথিত না হয়ে পারে না। ভারতে ইংরেজ আধিপত্যের পূর্বে সাম্প্রদায়িকতা কি বস্তু, তা জনগণের জানা ছিল না। ঐ সময়গুলোতে সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট বিষয় নিয়ে দেশে কোথাও একফোঁটা রক্তও ঝরে নাই।

ইংরেজদের শিক্ষায় শিক্ষিতরা সরকারি চাকরি লাভ করতেন। তাদের চাকরির ক্ষেত্র ছিল নিম্নপদস্থ কেরানি থেকে বড় জোর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত। অর্থাৎ তারা নিম্নপদস্থ আমলাও হতেন। কেবলমাত্র যারা প্রভুভক্তির চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে সক্ষম হতেন তাদের কপালেই জুটতো ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট জাতীয় উচ্চপদগুলি। দু'টি উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

(ক) সেকালে ভারতীয়দের পক্ষে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদটি পাওয়া খুব সহজ ছিল না, সরকারের অত্যন্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত না হলে এ পদ পাওয়া যেত না (চেপে রাখা ইতিহাস, পৃ: ২২৫ - গোলাম আহমদ মোর্তজা)।

(খ) সেদিনের বিদেশি শাসনের যুগে ভারতীয়রা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়ে উচ্চতর পদ পাওয়ার আশা করতে পারতো না (সুনীলকুমার বসু রচিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুস্তকের ১৩ পৃষ্ঠা)।

এই শিক্ষিত শ্রেণির মানসিকতা কেমন ছিল তা কিঞ্চিৎ অনুমান করা যায় ইংরেজ আমলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে চাকরি লাভকারী 'সাহিত্য সম্রাট' শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা থেকে। তিনি লিখেছেন, ''আমরা (শিক্ষিত বাঙালি সমাজ) ইংরাজি বা ইংরাজের দ্বেষক নহি। ইহা বলিতে পারি যে, ইংরাজ হইতে এ দেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরাজি শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান। অনন্তরত্নপ্রসূতি ইংরাজি ভাষার যতই অনুশীলন হয়, ততই ভাল। আরও বলি, সমাজের মঙ্গল অন্য কতকগুলি সামাজিক কার্য্য রাজপুরুষদিগের ভাষাতেই সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। ....ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, একপরামর্শী, একোদ্যোগী না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, একপরামর্শিত্ব, একোদ্যম, কেবল ইংরাজির দ্বারা সাধনীয়; কেন না, এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পাঞ্জাবী, ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজি ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে। অতএব যতদূর ইংরাজি চলা আবশ্যক, ততদূর চলুক। ...বাঙ্গালী অপেক্ষা ইংরাজ অনেক

গুণে গুণবান, এবং অনেক সুখে সুখী; যদি এই তিন কোটি বাঙ্গালী হঠাৎ তিন কোটি ইংরাজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না (বঙ্কিম রচনাসমগ্র, ২য় খণ্ড, বিবিধ প্রবন্ধ)।

আমাদের দেশের বর্তমান আমলা শ্রেণির মানসিকতা কি এর চেয়ে খুব বেশি স্বাধীনচেতা?

বেকার সমস্যা শিক্ষাব্যবস্থার ফসল

ইংরেজি শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক প্রশাসন চালাতে প্রয়োজনীয় কেরানিকূল সৃষ্টি করা। একটি দেশে সকল মানুষকে কেরানি বানিয়ে ফেলা কতবড় মূর্খতা তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না। ইংরেজদের বিদায়গ্রহণের পরও আমরা সেই শিক্ষা ব্যবস্থাই প্রয়োগ করে যাচ্ছি এবং বেসুমার কেরানি সৃষ্টি করে যাচ্ছি যা আমাদের দেশে (এবং সমগোত্রীয় দেশগুলিতে) বিরাট বেকারত্ব সমস্যা সৃষ্টি করেছে। সেই সমস্যার সাগরে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি। নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে না করতেই পাশ করে বেরোচ্ছেন আরও কয়েক লক্ষ কেরানি। জাতি হাঁসফাস করছে এই শিক্ষিত বেকারের চাপ সামলাতে, কারণ অশিক্ষিত মানুষ কদাচিত বেকার থাকে। তারা যে কোন কায়িক শ্রমের কাজে সম্পৃক্তি হতে দ্বিধা করে না। কিন্তু যখন কারও পোর্টফোলিওতে একটি বা দু’টি সার্টিফিকেট সঞ্চিত হয়ে যায়, তাকে আর কায়িক শ্রমে লিপ্ত করা যায় না। তার পারিপার্শ্বিকতা এবং মানসিকতা তার সামনে হিমালয়ের চেয়ে উঁচু বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়।

শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য মানবসম্পদের উন্নয়ন ও বিকাশ। কিন্তু আমাদের দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে, তা কোনোভাবেই সময়ের চাহিদা মেটাতে পারছে না, মননের তো নয়ই। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা অগ্রগতির নির্দেশক না হয়ে সমাজের জন্য অনেকটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষা নিয়ে আমরা যতই বাগাড়ম্বর করি না কেন, খুব বেশি এগোতে পারিনি। ব্রিটিশ আমলের কেরানি তৈরি করার শিক্ষারও যে উপযোগিতা ছিল, স্বাধীন বাংলাদেশে আমাদের সেটুকু উপযোগিতা না থাকা কেবল দুর্ভাগ্যজনক নয়, লজ্জাজনকও। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ত্রৈমাসিক শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৩ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪ সালের প্রথম প্রান্তিকে মোট শ্রমশক্তি ছিল ৭ কোটি ৩৭ লাখ। ২০২৪ সালের প্রথম প্রান্তিক শেষে বেকারের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৫ লাখ ৯০ হাজার। যা তার আগের প্রান্তিক অর্থাৎ ২০২৩ সালের শেষ প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) দেশে বেকারের সংখ্যা ছিল সাড়ে ২৩ লাখ। অর্থাৎ তিন মাসের ব্যবধানে দেশে বেকার বেড়েছে ২ লাখ ৪০ হাজার জন (বাংলা ট্রিবিউন, ৬ মে ২০২৪)।

এভাবেই বাংলাদেশে বাড়ছে বেকারের সংখ্যা। সেখানে সবচেয়ে উদ্বেগজনক চিত্র উচ্চ শিক্ষিতদের ক্ষেত্রে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২২ সালের শ্রমশক্তি সমীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও সমপর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ডিগ্রিধারী উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বর হার এখন ১২ শতাংশে পৌঁছেছে। ২০২৩ সালের হিসাব অনুযায়ী পূর্ববর্তী ৫ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রিধারী বেকারের সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে ৮ লাখ হয়েছে। করোনা মহামারির আগে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও)-এর এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে,

এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ২৮টি দেশের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত বেকারত্বের দিক থেকে বাংলাদেশ দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। প্রথম অবস্থানে রয়েছে পাকিস্তান।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) এর তথ্য বলছে দেশে বেকারত্বের হার হচ্ছে ৩.৬ শতাংশ। এরমধ্যে যুব বেকারত্ব প্রায় ৮০ শতাংশ। তাই যে কোনো চাকরিতেই এখন দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষাগত যোগ্যতা চাওয়া হয়, তার চাইতে বেশি শিক্ষাগত যোগ্যতাধারী প্রার্থীরা আবেদন করেন। একটি উদাহরণ দিই। গত ডিসেম্বর থেকে মার্চের (২০২৪) মধ্যে দুই ধাপে ২ হাজার ১৭২ ওয়েম্যান নিয়োগ দিয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। চতুর্থ শ্রেণির ওয়েম্যান পদের মূল কাজ রেলপথ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। এছাড়া রেললাইনের নাট-বল্টু টাইট দেওয়াসহ ছোটখাটো রক্ষণাবেক্ষণের কাজটিও তারাই করেন। কায়িক পরিশ্রমনির্ভর পদটিতে আবেদনের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করেছে এসএসসি বা সমমান। যদিও সর্বশেষ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ধাপ পেরিয়ে যারা ওয়েম্যান হিসেবে চাকরি পেয়েছেন, তাদের সবার শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স পাস।

এছাড়া নৈতিক শিক্ষার অভাবে বাংলাদেশীরা মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে কাজ করার সুযোগ হারিয়েছে বা হারাচ্ছে (বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি)। লন্ডনভিত্তিক ইকোনমিস্ট ইনটেলিজেন্স ইউনিটের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশেই স্নাতক ডিগ্রিধারী শিক্ষিত বেকারের হার সবচেয়ে বেশি, ৪৭ শতাংশ। অর্থাৎ প্রতি ১০০ জন স্নাতক ডিগ্রিধারীর মধ্যে ৪৭ জনই বেকার। এ কথা সবাই স্বীকার করবেন যে, একজন লেখাপড়া না জানা মানুষ বেকার থাকা আর শিক্ষিত মানুষের বেকার থাকা এক কাতারে ফেলা যাবে না। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র, পরিবার, সমাজ তথা জনগণ যে বিনিয়োগ করে থাকে, তার বিনিময়ে যদি আমরা কিছু না পাই, সেটি হবে মস্ত বড় অপচয়।

পত্রিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রতিবছর ২২ লাখ মানুষ শ্রমবাজারে প্রবেশ করেন। কিন্তু কাজ পান মাত্র সাত লাখ। বাকি ১৫ লাখ মানুষ জাতির বোঝায় পরিণত হয়। দেশের প্রত্যেক নাগরিক শিক্ষিত হোক, এটা জরুরি। কিন্তু তার চেয়েও বেশি জরুরি, সেই শিক্ষিত জনশক্তিকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগানো। প্রতিবছর যে লাখ লাখ জনশক্তির আগমন ঘটছে, তাদের কর্মসংস্থান করতে না পারলে সামাজিক অস্থিরতাই কেবল বাড়ছে না, অপরাধ প্রবণতাও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে।

আমার দেশ (১ জুলাই ২০১২) পত্রিকায় প্রকাশ, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির গবেষক মোহাম্মদ ইব্রাহিম বলেন, বাংলাদেশের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার কারণে শিক্ষিত বেকার সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। সেকেলে শিক্ষাব্যবস্থা কেরানি তৈরি করছে, দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে পারছে না। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির আরেক গবেষক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল বাকি বিল্লাহ জানান, শিক্ষার হার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেকারত্বের হার বেড়ে যাচ্ছে। পাসের হার বেড়ে যাওয়া মানেই বেকারত্বের হার বাড়া। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকেই শিক্ষিত বেকার তৈরি অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে। এই গবেষণায় আরও দেখানো হয়েছে প্রতি বছর সাধারণ শিক্ষায় ৪ লাখ শিক্ষার্থী স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় পাস করে। যাদের অধিকাংশ চাকরির আশায় থাকে এবং চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত ৬/৭ বছর পর্যন্ত বেকার থাকে। তারা বিশেষ কোনো কাজে দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। অনেক সময় দেখা যায় এদেশের সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে বিদেশে গিয়ে অন্যান্য দেশের মাধ্যমিক পাসকারীদের অধীনে চাকরি করে। সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় লেখাপড়া শেষ করার পর তাকে কোনো কাজ বা চাকরি করা উচিৎ সে সম্পর্কে

কোনো দিক নির্দেশনা দেয়া হয় না। প্রতিষ্ঠানে জব কাউন্সিলিং না থাকার কারণে শিক্ষার্থী বুঝতে পারে না সে কোন কাজ করার যোগ্যতা রাখে।

এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিটি ব্রিটিশ শাসনের যুগেই জাতির জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উনবিংশ শতকে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন হওয়ার পরে আমাদের সমাজে এই 'শিক্ষিত' মধ্যবিত্ত শ্রেণিটি গড়ে ওঠে। এই সমাজের মানসিক স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ১৯৪৮ সনে শ্রী প্রমথনাথ বিশি লিখেছেন, "এ সময় বাঙলা দেশে দ্রুত একটা মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়িয়া উঠিল। ইহা একাধারে ইংরাজশাসনের কীর্তি ও অপকীর্তি, একাধারে ইহাই তাহার প্রতিষ্ঠা ও বিনাশের কারণ। মধ্যবিত্ত চাকরিগতপ্রাণ শ্রেণির সাহায্যেই ইংরাজ এদেশে শাসন করিয়াছে- অবশেষে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিই ইংরাজশাসনে বীতরাগ হইয়া তাহার প্রতিষ্ঠার প্রথম ইষ্টকখানা টানিয়া ফেলিয়া দিয়া বৈদেশিক শাসনের বেদীকে শিথিল করিয়া দিল। বাঙালী সন্ত্রাসবাদীগণের সকলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোক।

এখন অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির মান-মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা আর পূর্ববৎ নাই, ব্যাপক যন্ত্রশিল্পের প্রসারের ফলে তাহাদের প্রভাব প্রতিদিন কমিতে থাকিবে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে লইয়া বাঙলা দেশের বিশেষ সমস্যা। বাঙলার বিশিষ্ট সমস্যা লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত, নানাগুণে কৃতী, অধুনা অসহায় ও অসন্তুষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণি। ইহারাই একদা ভারতবর্ষে ইংরাজশাসন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিয়াছে, বাঙালীর সংস্কৃতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছে এবং ইংরাজশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে! এখন ইহারা ক্লান্ত এবং জীবিকা অর্জনে অক্ষম প্রায়। এখন ইহারা 'De-mobilised' সৈন্যের মত অসহায়ভাবে ঘুরিয়া মরিতেছে। কর্তৃপক্ষ ইহাদের ভাবেন অবাঞ্ছিত, সাধারণে ভাবে অতিরিক্ত, আর ইহারা নিজেদের ভাবে অভিশপ্ত। মধ্যবিত্ত শ্রেণির সুষ্ঠু সমাধান না ঘটিলে ইহারা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে দিবে না, হয়তো সেই অশান্তির ফলে আবার শাসনবেদীর ইট খসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিবে। ইহাদের প্রত্যেকেই থলিতে সম্ভাবিত লাল নিশান গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছে।
আজ এই যে অবস্থায় আমরা আসিয়া পৌঁছিয়াছি, ইহার মূল হেয়ারের পাঠশালায় এবং হিন্দু কলেজের পাঠ্য গৃহে। সেকালে ইংরাজী শিখিলেই চাকরি জুটিত, লাট সাহেব ডাকিয়া ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেন; কেহ বলিত মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, কেহ বলিত বাবার মত জানিয়া জানাইব, আবার কাহাকেও অনুরোধ করিলে বলিত অ-গঙ্গার দেশে মা যাইতে দিতে রাজি নন। সেকালে চাকরিদাতাই উমেদার ছিলেন। একালে ইংরাজী জানা দূরের কথা, ইংলিশ চ্যানেল গিলিয়া খাইলেও চৌকিদারটাও ফিরিয়া তাকায় না। সেকালের সমাধান-একালের সমস্যায় পরিণত। সেকালের জ্ঞান-কৈবল্যের তীক্ষ্ম তরবারি একালের কর্মহীন বাঙালীর হাতে পড়িয়া কেবল চুল চিরিবার চেষ্টা করিয়া দলে দলে 'অমিত রায়ের' সৃষ্টি করিতেছে।" (চিত্র-চরিত্র- শ্রী প্রমথনাশ বিশী)। বাক্যবাগীশ অমিত রায়ের 'দুর্দান্ত স্মার্ট' চলনবলন সম্পর্কে রবীন্দ্র সাহিত্যের পাঠকরা নিশ্চয়ই জানেন।

কেরানিগিরি একটি একঘেয়ে কাজ, এতে কোন সৃজনশীলতা নেই। ব্রিটিশ আমলে ফটোকপি মেশিন না থাকার যুগে কেরানিরা দলিল-দস্তাবেজ দেখে দেখে হুবহু কপি করতেন বলে এর ইংরেজি প্রতিশব্দে রাইটার শব্দটি ঢুকে গেছে। কলকাতার সচিবালয়কে বলা হয় রাইটার্স বিল্ডিং। এক কেরানি হুবহু কপি করতে বসে বিপদে পড়েছিলেন, একটি শব্দের ওপর মাছি মরে লেপ্টে গিয়েছিল। তিনি কিছুতেই শব্দটি বুঝতে পারছিলেন না। শেষতক বুদ্ধি খাটিয়ে বের করলেন, একটি মাছি মেরে কপিতে লেপ্টে দেবেন। তিন দিন ধরে অমানুষিক পরিশ্রম করে তিনি একটি মাছি মারলেন এবং সেটি জায়গামতো লেপ্টে দিলেন। একেবারে হুবহু কপি যাকে বলে! কথিত আছে- এ থেকেই বাংলায় 'মাছি মারা কেরানি' প্রবাদটির সৃষ্টি। কৃশানু ভট্টাচার্যের একটি লেখা থেকে এ তথ্যটি জানা গেল। কেরানি নিয়ে ব্রিটিশ আমলে জরিপও হয়েছে! বিখ্যাত সিভিলিয়ান, সাংবাদিক, শক্তিশালী লেখক, বড়লাটের

শাসনপরিষদের সদস্য এবং পরামর্শদাতা সর্বোপরি ব্রিটিশ সরকারের Director General of Statistics হান্টার সাহেব এই জরিপের কাজটি করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে ১৮৭০ সালে কেরানির সংখ্যা ছিল ১০ হাজার ২৪৭ জন। ১৮৮১ সালে তা পৌঁছায় ১৬ হাজার ৩১৫-তে। তারও ১০ বছর বাদে ১৮ হাজার ৯৫০-এ। এভাবে উত্তরোত্তর কেরানির সংখ্যা বৃদ্ধিই বোধ হয় বাঙালির কেরানি মানসিকতার বদনাম তৈরি করেছিল। ১৮৮৬-তে উইলিয়াম হান্টারকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর করা হয় এবং তিনি এডুকেশন কমিশনের প্রেসিডেন্টের পদটিও পেয়েছিলেন। দ্য ইন্ডিয়ান মুসলমানস তার সবচেয়ে বিখ্যাত বই যে বইটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন তার একান্ত বন্ধু মি. হাডসনের নামে- সেই হাডসন যিনি দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের রাজবাড়ির ২৯টি কচি বাচ্চা হত্যা করে তাদের কাটা মাথা ঝুড়িতে সাজিয়ে উপহার দিয়েছিলেন বৃদ্ধ বাদশাহকে।
মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। কেরানি শব্দটি আমাদের কাছে তুচ্ছ বিষয়ের প্রতীক। কেরানি মানে অধীনস্থ, পরাধীন, চিন্তাহীন একজন মানুষ। তার কোনো অধিকার থাকবে না মতামত দেওয়ার। বোধ থাকবে না। সে শুধুই অপরের আজ্ঞাবহ। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানি আমেরিকার রাষ্ট্রদূতকে বলতেন আমেরিকার কেরানি। তিনি বলতেন, কেরানির সঙ্গে কিসের আলোচনা! তাকে একবার আলোচনার জন্য ডাকাও হয়েছিল। কিন্তু আলোচনায় বসতে অস্বীকার করেন তিনি। আমাদের দেশি বিষয়ে আমেরিকার কেরানির কী মত থাকতে পারে, এ নিয়ে তিনি দ্বিধায় ছিলেন। স্বাধীন রাষ্ট্রের ব্যাপারে কেরানির মত নেওয়ার কথা শুনে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। স্বাধীনচেতা দেশপ্রেমিকের সাহসী উচ্চারণ। কিন্তু বর্তমানে আমাদের রাষ্ট্রনায়করা এতটাই মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়েছেন যে তারা ব্রিটেন-মার্কিন রাষ্ট্রদূতদেরকে দিবানিশি তোয়াজ করে চলেন। রাজনৈতিক দলগুলির প্রধান ব্যক্তিরা নির্বাচনের আগে নির্বাচনে জয়ী হলে তারা কেমন সরকার গঠন করবেন সেই রূপরেখা জনগণের সামনে পেশ করার আগে পেশ করেন বিদেশের রাষ্ট্রদূতগণের বরাবরে (খবর- মানবজমিন, ১৩/০৮/১৩), কারণ তাদের ধারণা ইউরোপ-আমেরিকার দূতরাই তাদের ভাগ্য বিধাতা।

ব্রিটিশরা কী দিল কী নিল?

মোগলরা ভারতে জাতীয় শাসন কায়েম করেছিল এবং তাদের শাসনব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। তথাপি ইংরেজরা একে মুসলমান শাসন বলে চালিয়ে এসেছে এবং মারাঠা শাসনকে হিন্দু শাসন বলে প্রচার করেছে। কিন্তু মারাঠা রাজার অধীনে অনেক পদস্থ ব্যক্তি মুসলমান ছিল। এই সত্যগুলি ইতিহাসের পাতায় এখনও অম্লানভাবে রয়েছে। এই অপপ্রচার দ্বারা তারা ভারতীয় মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়কে পরস্পর শত্রুরূপে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিতে চেয়েছে এবং শতভাগ সফলও হয়েছে। এই অপপ্রচারের ব্যাপকতা ও মহিমার শক্তিতে ইংরেজরা প্রায় দু'শ বছর আমাদের শোষণ, নিষ্পেষণ, হত্যা এবং পায়ের তলায় পিষ্ট করে রাখতে সমর্থ হয়েছিল। যতদিন মানবসভ্যতা থাকবে, ততদিন এই কলঙ্ক মুছবে না। এদেশীয় শিক্ষিত এবং ইংরেজ শাসনে লাভবান ব্যক্তিবর্গ এই সহজ সত্যগুলি ধরতে যে পারতো না তা নয়। তবে তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক স্বার্থে, ক্ষমতার লোভে সর্বোপরি দাসত্বমূলক শিক্ষাব্যবস্থার প্রত্যক্ষ ফলে এরা পশুর মত নির্বোধ হয়ে গিয়েছিল। পরিতাপের ও আফসোসের বিষয় হলেও শত শত মীরজাফর, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভদের প্রেতাত্মার আত্মঘাতী প্রভাব হতে তখনকার মত আজও আমরা মুক্তি পাইনি।

আসল কথা হলো, ইংরেজ শাসনের পূর্বে ভারতে কখনও সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। এই 'সুপেয় মধু' আমদানি করে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা এবং পরবর্তীকালে তাদের দেওয়া শিক্ষায় শিক্ষিত চেলা-চামুণ্ডারাই এই আত্মঘাতী বস্তুকে ব্যবহার করে আসছে নানা কায়দা ও কৌশলের মাধ্যমে। পাঞ্জাবের রণজিৎ সিংহের শাসন (১৭৯৯-১৮৪৯) এবং ছত্রপতি শিবাজীর মারাঠা শাসনকে (১৬৭৪-১৮১৮) ভারতের অধিকাংশ জনগণ অন্তর দিয়ে স্বীকার করে নেয়নি, ফলে সেগুলির সাংস্কৃতিক প্রভাব ভারতীয় মানসে তেমন স্থায়ীরূপ নেয় নি। তখন রাজায় রাজায় শাসকে শাসকে লড়াই হয়েছিল। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কখনোই যুদ্ধ হয়নি। কিন্তু ইংরেজরা এসে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কতিপয় ক্ষমতালোভী এবং অর্থপিপাসু লোকের ষড়যন্ত্রে, জনসমুদ্রের অজান্তে অন্তর্বিরোধের সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা প্রদেশগুলি একটির পর একটি অধিকার করতে থাকে। অবশ্য এজন্য আমাদের জাতীয় বিশ্বাসঘাতকদের বিস্তর 'অবদান' রয়েছে যারা সক্রিয়ভাবে ইংরেজদের পক্ষে যোগ দিয়েছিল। কেউবা পদলোভে, কেউবা অর্থ এবং চাকরির লোভে। নইলে ইংরেজ সাম্রাজ্য ভারতে কখনোই প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হতো না। মোগল শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের অপরাপর রাজাগণ শাসনে, সভ্যতায় মোগলদের থেকে কোন কিছুতে উৎকর্ষ দেখাতে পারেন নি। এটাই ইতিহাস। আমি কিন্তু মোগল শাসনের সাফাই গাইছি না, তারাও প্রকৃত মুসলিম ছিল না, তবে তাদের শাসনব্যবস্থায় ইসলামের যথেষ্ট প্রভাব ছিল, শাসকদের মধ্যেও অনেকের যথেষ্ট আত্মিক পরিশুদ্ধি ছিল। কিন্তু প্রকৃত ইসলাম ছিল না। যা ছিল সেটা হচ্ছে ইসলামী সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ। ইংরেজদের প্রবর্তিত জড়বাদী সভ্যতার তুলনায় সেই ধ্বংসাবশেষও ছিল হাজারগুণ বেশি সভ্য, উন্নত, ন্যায়-শান্তি, সুবিচারে পূর্ণ। এই দু'টি সভ্যতার মধ্যে একটি তুলনামূলক চিত্র অঙ্কনের জন্যই এই বিষয়ের অবতারণা করছি।

আর একটি কথা না বললে আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার হয় না। তা হলো এই যে, যদিও কতিপয় লোকের মগজে আজও একটি কথা ঘুরপাক খাচ্ছে, তা হলো ইংরেজরা ভারত অধিকার করবার সময় তারা ভারতীয়দের চেয়ে সভ্যভব্য বেশি ছিল। এ সব উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত প্রচার তাদের মগজেই শুধু সীমাবদ্ধ থাকেনি, থাকছে না, তারা লেখনীর মাধ্যমেও এ সব কথা নানা কায়দায় বলে আসবার চেষ্টা পাচ্ছে। যদি সত্য-তত্ত্বের উপর নির্ভর করে এসব কথা বলা হতো, তবে আপত্তির কিছুই ছিল না। তাহলে ইংরেজরা যুদ্ধগুলিতে এভাবে জিতলো কেন? এর জবাব রয়েছে পবিত্র কোর'আনের সুরা তওবার ৩৮-৩৯ নং আয়াতে যেখানে আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা যদি আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রামে বহির্গত হওয়া ত্যাগ করো তবে তিনি তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের উপর অন্য জাতি চাপিয়ে দেবেন।' দিকভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট, লক্ষচ্যূত মুসলিম জাতির এই নির্মম পরিণতির প্রকৃত কারণ এটাই। আসলে ভারতে যে সভ্যতা মুসলিম শাসনের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল সেটা কোন বিচারেই ইংরেজদের থেকে পিছিয়ে ছিল না, কিন্তু এটা ছিল আল্লাহর শাস্তি। আরও বলা যায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের লীলাভূমি বাগদাদের খলিফা পরাজিত হলেন অসভ্য মোঙ্গলদের বাহিনীর নিকট। ইংরেজদের জয়টাও ভারতীয়দের উপর এমনটাই হয়েছিল।

ইংরেজ শাসনামলে একদিকে যেমন ভারতের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে ভারতকে ভিক্ষুকে পরিণত করা হয়েছে, তেমনি আবার শিল্পের কারিগরি বিদ্যা দেশের লোক যা জানতো এই শিল্পবিদ্যা ইংরেজদের থেকে অনেকাংশে উৎকৃষ্ট এবং নিপুণতাপূর্ণ ছিল বলে তাও আবার সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা ধ্বংস করেছিল। করেছিল ইংল্যান্ডে শিল্পজাত দ্রব্যগুলির সুবিধার্থে। ধন-সম্পদ ঐ সময়গুলিতে প্রচুর ছিল এবং তা দেশে থাকলে যে কোন বিদ্যা আয়ত্ত করতে বেশি বেগ পেতে হতো না। এখন দারিদ্র্য এমন এক ধ্বংসাত্মক ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এর সর্বদিকটাই বিষময়, ক্ষতিকর। ইংরেজ শাসনে বিরাট ক্ষতিই হয়েছে, কৃষি এবং শিল্প সামগ্রীর, দেশের কৃষক, মজুরদের। রাষ্ট্রীয় একচোখা নীতির শিকার হয়ে সরকারি চাকরি ও অর্থকরী বৃত্তি থেকে বিচ্যুত হয়ে মুসলমান

সমাজ ক্রমশ শাসকের জাতি থেকে দরিদ্র হতে হতে নিঃস্ব ভিখারিতে পরিণত হলো। তাদের এই অর্থনৈতিক অবস্থার পতন উইলিয়াম হান্টার দ্যা ইন্ডিয়ান মুসলমানস বইয়ে উল্লেখিত হয়েছে এভাবে, A hundred and seventy years ago it was almost impossible for well-born Musalman in Bengal to become poor: at present it is almost impossible for him to continue rich. অর্থাৎ 'একশ সত্তর বছর আগে সম্ভ্রান্ত পরিবারের একজন মুসলিমের পক্ষে দরিদ্র হওয়া ছিল প্রায় অসম্ভব; অথচ এখন তাদেরই কারও পক্ষে ধনী হওয়া তেমনটাই অসম্ভব।'

দারিদ্রের এই পাহাড়সম বোঝা ভারতবাসীর উপর চাপিয়ে দিয়ে ইংরেজ বিদায় নিয়েছে, শাসক হিসাবে রেখে গেছে তাদের তল্পিবাহক দেশীয় শাসক শ্রেণি। এর ফলে আমাদের ভৌগোলিক স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে গেছে।

এ ব্যাপারে আমরা সখারাম গনেশ প্রণীত 'দেশের কথা' থেকে তথ্যভিত্তিক উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাবো যে, এ দেশবাসীর ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের প্রথম দিকে কী ধরনের অনীহা ছিল:

কিন্তু তাহারা (ইংরেজ) ভারতবর্ষীয় সমাজে এ সকলের আবির্ভাব কামনা করেন নাই; তাহারা চাহিয়াছেন, ভারতে শ্রমশীল কৃষক সম্প্রদায়ের বাহুল্য; কাজেই ভারতের ৮৫ জন আজ কৃষিজীবী- তাহারও আর্দ্ধাংশ চিরকাল অর্দ্ধাশন-ক্লিষ্ট! কারণ 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' অর্থাৎ নিয়তগুণে বরকত।'

ইংরেজরা তাদের সন্তানদের ইঞ্জিনিয়ারিং শেখানোর জন্য রুড়কি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করেছিল যা দেশীয় মানুষের অর্থে স্থাপিত হলেও সেখানে দেশীয় যুবকদের প্রবেশের পথ প্রথম থেকেই রাজপুরুষরা যথাসাধ্য কণ্টকিত করে রেখেছিল। পরে একেবারেই বাঙালী ও মহারাষ্ট্রীয়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। প্রথমত দেশীয়দেরকে পরীক্ষায় পাশ করানোই হতো না। তারপরও যারা উত্তীর্ণ হতো, তাদের অর্ধেক লোককেও চাকরি দেওয়া হত না। শ্রীযুক্ত নৌরজী মহাশয় দেখিয়েছেন, যে সময়ের মধ্যে ৯৬ জন শেতাঙ্গ যুবক পাশ করেছে ও তাদের মধ্যে ৮৬ জন বড় চাকরি পেয়েছে, সেই সময়ের মধ্যে দেশীয় যুবকদের ১৬ জনের ভাগ্যে পরীক্ষায় সাফল্য ও কেবল ৭ জনের ভাগ্যে চাকরি লাভ (তাও নিম্নশ্রেণিতে) ঘটেছে।'

সুতরাং এটা প্রমাণিত যে ইংরেজরা প্রথমদিকে চায়নি ভারতবাসী শিক্ষিত হোক, বরং কৃষক বানিয়ে রাখতে চেয়েছে। এমনকি যখন তারা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ করল সেখানেও ভারতবাসীকে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হলো না। আসলে ইংরেজরা আমাদেরকে তাদের শিল্প-সভ্যতা শেখাতে ইচ্ছুক ছিল না। শুধু তাদের কেরানিগিরি চাকরি করবার জন্য যতটুকু শিক্ষা দেওয়ার দরকার তাই তারা শেখাতে ইচ্ছুক ছিল। মোগল আমলে মুসলমান হিন্দু সকলেই উচ্চ হতে উচ্চতর রাজপদে বড় বড় পদগুলি পেয়ে এসেছেন। তারা নিজেদের দেশ নিজেরা শাসন করেছেন। অথচ ইংরেজদের শাসন ও প্রচার শুনে আমরা নাবালক ও কচি খোকা হয়ে পড়েছিলাম। ইংরেজদের প্রচারের ভাবখানা ছিল এই, 'তোমরা অসভ্য, তোমরা কিছু জান না, তোমরা কিছু করতেও পারবে না। যা কিছু করার আমরাই করব।' অথচ ইংরেজ ভারতবর্ষ দখল করার পূর্ব অবধি মোগল শাসনের ভারত শুধু ইংল্যান্ড নয়, ইউরোপের যে কোন শীর্ষস্থানীয় দেশগুলির চেয়ে শিল্পে, বাণিজ্যে, সভ্যতায় শীর্ষস্থানীয় ছিল। এই সত্য ইতিহাসের পাতা খুললে স্পষ্ট ধরা পড়ে। অথচ একটি মহান সভ্য জাতিকে সব কিছু সভ্যতার পোশাক খুলে একেবারে নাঙ্গা উলঙ্গ, দীন হতে দীন দরিদ্র করে রাখা হয়েছিল। আমাদের প্রতিটি শিল্প ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। আসল কথা হলো- সাম্রাজ্যবাদী বিদেশি ইংরেজরা যত প্রকারে পারে শোষণ করবার জন্যই এসেছিল এবং তারা করেছিলও

তাই। এসব সত্য কথা আমাদের ভুললে চলবে না। এই সময়গুলিতে ভারতবর্ষের দশ কোটি লোক ইংরেজ শাসনের মহিমার গুণে অভুক্ত ও অর্ধভুক্ত ছিল।

আমরা মূল প্রসঙ্গ থেকে একটু সরে গিয়ে হলেও ব্রিটিশ ভারতের দুর্ভিক্ষের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। উদ্ধৃতাংশটি শ্রী সখারাম গনেশ দেউস্কর প্রণীত 'দেশের কথা' গ্রন্থ (পঞ্চম সংস্করণ : অগ্রহায়ণ ১৩১৫) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতীয় দুর্ভিক্ষের ইতিহাসে নেত্রপাত করিলে, দুর্ভিক্ষের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ক্রমেই কিরূপ ঘনিষ্ঠ হইতেছে, তাহা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধ হইবে। বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সর্বত্র এক প্রকার অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল, ইংরেজি ইতিহাসে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ শত বৎসরের মধ্যে ভারতে চারিবারের অধিক দুর্ভিক্ষপাত হয় নাই। দুর্ভিক্ষের বিক্রমও এক একটি প্রদেশেই আবদ্ধ ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এ দেশে ইংরাজের শাসন ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সঙ্গে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসও আপনার আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছে। বিগত শতাব্দীর প্রথম পাদে বা ১৮০১ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দ কাল পর্যন্ত সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে দশ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষজনিত অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, উহার দ্বিতীয় পাদে পাঁচ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। বিগত শতাব্দীর তৃতীয় পাদে এ দেশে সিপাহী বিদ্রোহে সংগঠন ও পরিণামে সমগ্র ভারতে ইংরাজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সেই পঞ্চবিংশ বৎসরে দুর্ভিক্ষও আপনার শাসন এদেশে সুদৃঢ় করিয়াছে। সরকারি রিপোর্টে প্রকাশ, খ্রিস্টীয় ১৮৫০ অব্দ হইতে ১৮৫৭ অব্দের মধ্যে ব্রিটিশ ভারতে ছয়বার দুর্ভিক্ষ হয়। তাহাতে পঞ্চাশ লক্ষ ভারতবাসী কঠোর যন্ত্রণায় ইহধাম ত্যাগ করিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের দুর্ভিক্ষকাহিনী অধিকতর শোকাবহ। এই পঞ্চবিংশ বর্ষের মধ্যে এদেশে অষ্টাদশবার দুর্ভিক্ষের দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এই মহানলে প্রায় ২ কোটি ৬০ লক্ষ মহাপ্রাণী ভস্মীভূত হইয়াছে। ইহার মধ্যে সুদ্ধ বিগত দশ বৎসরেই এক কোটি ৯০ লক্ষ ভারত সন্তান 'হা' অন্ন! হা- অন্ন!' করিয়া বিষম যন্ত্রণায় প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে। এই হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে 'দুর্ভিক্ষ নিহত' হতভাগ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া মহামতি উইলিয়াম ডিগ বি সি, আই. ই. মহোদয় গভীর খেদ সহকারে বলিয়াছিলেন:

You have died, you have died unless by.
তোমরা মরিয়াছ, তোমরা অনর্থক মরিয়াছ।

সাধারণের বিশ্বাস যুদ্ধে যেরূপ লোকক্ষয় হইয়া থাকে, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। কিন্তু ভারতীয় দুর্ভিক্ষের ইতিহাস পাঠ করিলে এই ধারণার ভ্রমাত্মকতা প্রতিপন্ন হইবে। ডিগবি মহাশয় দেখাইয়াছেন, 'বিগত ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একশত সাত বৎসরে সমগ্র পৃথিবীতে যুদ্ধ-বিগ্রহে সর্বসমেত ৫০ লক্ষের অধিক লোক নিহত হয় নাই। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে ভারতে ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ লোক অনশনে পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছে। তৃণাভাবে গো-মেষ মহিষাদি যে কত মরিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। ফলতঃ ভারতের দুর্ভিক্ষ-সর্ব্বলোকের ভয়প্রদ মহাসমর অপেক্ষাও অধিকতর ভয়ঙ্কর।....আসল কথা এই যে, শস্যাভাব কিন্তু ভারতীয় দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ নহে। পৃথিবীতে এরূপ অনেক দেশ আছে যে, যেখানে জনসংখ্যার অনুপাতে শস্যোৎপাদন যোগ্যভূমির পরিমাণে অতি সামান্য। বিলাতেই কৃষিযোগ্য ভূমির অভাব অত্যন্ত অধিক। তথায় যে শস্যাদি উৎপন্ন হয় তাহাতে ইংলন্ডবাসীর ৯১ দিনের উদরপূর্তি হওয়া অসম্ভব। তথাপি বৎসরের অবশিষ্ট ২৭৪ দিন ইংলন্ডবাসীর অনশনে যাপন করিতে হয় না। প্রকৃতির নিষ্ঠুরতায় বা দৈবের বিড়ম্বনায় অন্নকষ্টের সম্ভাবনা হইলে সভ্য জাতিমাত্রেই দূরদেশ হইতে শস্য আনয়ন করিয়া আপনাদিগের প্রয়োজন সিদ্ধি করিয়া থাকেন। আমাদিগের ভারতবর্ষ হইতেই প্রতি বৎসর ১৬।। ০ কোটি টাকার গোধুম (গম) ও তণ্ডুলাদি (চাল) সমুদ্রপথে ঐ সকল দেশে (ইউরোপ) গমন

করিয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগের ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। ইউরোপীয় দেশসমূহের লোকেরা সহস্র যোজন দূরবর্তী দেশ হইতে শস্য সংগ্রহপূর্বক সুখ ও স্বচ্ছন্দতা সহকারে কাল যাপন করে, আর ভারত সন্তান গৃহপার্শ্বে বিশাল শস্য-শ্যামল ক্ষেত্র থাকিতেও দলে দলে অনশনে প্রাণ ত্যাগ করে।'

এই অবস্থা কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল সে মানব ইতিহাসের এক মর্মান্তিক অধ্যায়, কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তু ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থায় ফিরে আসছি। ইংরেজ শাসকদের এজেন্ট জমিদাররা কর আদায়ের নামে যে অত্যাচার করতেন তার ইতিহাস পড়লে চমকে যেতে হয়। ইংরেজ সরকারকে যেখানে তিন কোটি টাকা কর দিতে হত সেখানে গরীর চাষিদের ও শ্রমিকদের কাছ থেকে করা আদায় করা হত ১৮ কোটি টাকা। মনগড়া এমন কতগুলো কর আদায় করা হত যা জানাতেও লজ্জাবোধ হয়। তার সংখ্যা ১৫ বা ততোধিক। যেমন টহুরী, বিয়ের সেলামী, পূজাপার্বনী, জমিদার পুত্রদের স্কুল খরচা, জমিদার পরিবারের তীর্থ খরচা, রসদ খরচা অর্থাৎ সাহেবরা এলে তাদের খাতির তোয়াজ করতে যে খরচা, ডাক খরচা, ভিক্ষা বা মাঙ্গন অর্থাৎ জমিদারের ঋণ শোধ করার জন্য কর, পুলিশ খরচা, ভোজ খরচা, সেলামী অর্থাৎ চাষী নতুন বাড়ি করলে তার দক্ষিণা, আয়কর, খারিজ দাখিল, নজরানা, মুসলিম চাষীদের দাড়ির উপরে কর প্রভৃতি। ডক্টর বদরুদ্দিন উমরের 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ঊনিশ শতকের বাঙালি সমাজ' পুস্তকে এ তথ্য থাকলেও চিন্তাশীল লেখক রাধারমণ সাহার 'পাবনা জেলার ইতিহাস'- এর ৯২ পৃষ্ঠা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। কর ছাড়াও জমিদাররা ১৬ রকম শাস্তি দিতেন গরীব চাষী ও প্রজাদের। যেমন 'দণ্ডঘাত বা বেত্রাঘাত, চর্মপাদুকা প্রহার, বাঁশ ও লাঠি দিয়ে বক্ষস্থল দলন, খাপরা দিয়ে নাসিকা ও কর্ণ মর্দন, মাটিতে নাসিকা ঘর্ষণ, পিঠে হাত বেঁধে বংশ দণ্ড দিয়ে মোড়া দেওয়া, গায়ে বিচুটি পাতা দেওয়া, ধানের গোলায় পুরে রাখা, চুনের ঘরে বন্ধ করে রাখা, লঙ্কা মরিচের ধোঁয়া দেওয়া ইত্যাদি। (দ্র: সাময়িক পত্রে বাংলা সমাজ চিত্র : বিনয় ঘোষ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৯, ১২৩)

ইংরেজের নির্দেশে কর আদায়ের নামে জমিদারদের যে অত্যাচার চলছিল সে প্রসঙ্গে 'সাহিত্য সম্রাট' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইংরেজ অথবা জমিদার যে কোন একপক্ষের সমর্থনে লিখলেন, 'অনেক জমিদারির প্রজাও ভাল নহে। পীড়ন না করিলে খাজনা দেয় না। সকলের উপর নালিশ করিয়া খাজনা আদায় করিতে গেলে জমিদারের সর্বনাশ হয়। (বঙ্কিম রচনাসমগ্র ২য় খণ্ড পৃ: ২৯৮)।

ইংরেজের শাসনের নামে শোষণের দৃশ্য শিক্ষিত নিরক্ষর সকলকেই অবাক করে। একদল সাহসী হয়ে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে গিয়ে নিহত, আহত, প্রহৃত অথবা কারাগারে নির্বাসিত হন; তারা আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ঐতিহাসিক উপাদান। আর যারা বেদনায় মর্মাহত হয়ে চুপ করে সহ্য করে গেছেন, সাধ্য হয় নি তা রুখবার - তারাও জাতির কাছে অশ্রদ্ধার পাত্র নন। কিন্তু যারা অপশাসন আর শোষণের পক্ষে ওকালতি করেছেন, কলম ধরেছেন এবং হৃদয় দিয়ে সমর্থন করেছেন, তাদেরকে দেশের শত্রু বলতে কেউ লজ্জা করবে না। ঋষি, সাহিত্য সম্রাট, ভারতের স্বাধীনতার স্রষ্টা বলে কথিত বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্মানের শ্রেষ্ঠতম আসনে বসাতে গিয়ে ভাবতে হয় ব্রিটিশ শাসনের যুগে ভারতবর্ষে যে অভাব হানা দিয়েছিল তার কারণ উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে তিনি কীভাবে লিখেছিলেন, 'উষ্ণতাজনিত শারীরিক শৈথিল্য, পরিশ্রমে নিস্পৃহতা ও ভিন্নদেশে গমনেচ্ছার অভাবে দেশের ধনোৎপাদন যথোচিত বর্ধিত হয় নি।'' এখানে বুঝতে বেশি অসুবিধা হবে না যে, তিনি দুর্ভিক্ষের কারণ হিসাবে ইংরেজকে বাদ দিয়ে ভারতবাসীকেই অভিযুক্ত করেছেন।

রাজনীতিতে শিক্ষিতদের ব্যবহার

ব্রিটিশদের আরেকটি বড় ষড়যন্ত্র ছিল ভারত উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করা। এই লক্ষ্যে তাদের রোপিত ষড়যন্ত্রের বিষবৃক্ষ বহুদিকে শাখা প্রশাখা বিস্তৃত করেছিল। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকেও এই হীন উদ্দেশ্যে তারা ব্যবহার করেছিল। ব্রিটিশদের নিষ্ঠুর শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে ভারতজুড়ে বিদ্রোহী দল দানা বেঁধে উঠেছিল। এসব আন্দোলনের সদস্যরা চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে অত্যাচারী জমিদার ও ইংরেজদেরকে হত্যা করতো। এসব আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইংরেজ শাসকদের প্রয়োজন পড়েছিল একদল দেশীয় রাজনীতিক যারা ঐ বিদ্রোহী দলগুলিকে কৌশলে নিবৃত রাখবে, বাহ্যত তারা স্বদেশী মানুষের স্বার্থ আদায়ের জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে 'নিয়মতান্ত্রিক' আন্দোলন করবে, দেশের মানুষের দাবিদাওয়া নিয়ে সরকারের কাছে পেশ করবে। কিন্তু তারা অবশ্যই ব্রিটিশ রাজের সার্বভৌমত্ব মেনেই দাবি আদায়ের রাজনীতি করবে, স্বাধীনতার জন্য নয়। আর স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র ধরার তো প্রশ্নই আসে না। এই রাজনীতিকরা ভুলেও প্রশ্ন করবে না যে, 'আমরা কেন তোমাদের কাছে দাবি দাওয়া পেশ করব, তোমরা কারা?' এই রাজনীতিকরা দেশের সকল বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহীদেরকে একটি অহিংস মঞ্চে জড়ো করে ইংরেজ শাসনের রক্ষাকবজ হিসাবে কাজ করবে।

এ প্রকল্পের আওতায় সর্বপ্রথম যে রাজনৈতিক দলটি প্রতিষ্ঠা করা হয় সেটি হচ্ছে ন্যাশনাল কংগ্রেস। এই দলটির প্রতিষ্ঠা হয় ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের মাধ্যমে। এ বিষয়ে ইন্ডিয়া টুডে পত্রিকা থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি: ''প্রকৃতপক্ষে বড় লাটের সাহায্যে সংগোপনে রচিত পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে ও পরিচালনায় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ গণশক্তির পুঞ্জীভূত ক্রোধ হতে ইংরেজ শাসনকে রক্ষা করার জন্য অস্ত্ররূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই শাসক গোষ্ঠীর দ্বারা জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আয়োজন করা হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হতে ভারতের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার এ প্রয়াসের উদ্দেশ্য ছিল আসন্ন বিপ্লবকে পরাজিত করা অথবা আরম্ভের পূর্বেই তা ব্যর্থ করা (R. P. Dutt : India Today p. 289-90)।

কংগ্রেসের সভাপতি ১৮৮৫ এর ২৯ ডিসেম্বর তার ভাষণে বলেছিলেন, 'এটা বোধ হয় অনেকের কাছে নতুন সংবাদ যে ভারতীয় কংগ্রেস, যা প্রথমে সৃষ্টি হয়েছিল এবং এখনও কাজ করে যাচ্ছে - সেটি বাস্তবিক পক্ষে লর্ড ডাফরিনের দ্বারা গঠিত হয়েছিল, যখন এ মহাপ্রাণ ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন... লর্ড ডাফরিন হিউমের [অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম (১৮২৯-১৯১২) কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা] সাথে এ শর্ত করেছিলেন যে যতদিন তিনি ভারতে থাকবেন, ততদিন কংগ্রেস গঠনের নেপথ্যে তার অবদানের কথা সাধারণ্যে প্রকাশিত হবে না। তার এ শর্ত অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়েছিল।'' (জাস্টিস আব্দুল মওদুদ: মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ, পৃষ্ঠা: ২৩৫-২৩৬)।

পরবর্তীতে এই কংগ্রেসের কর্ণধার হয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী এবং তারপরই সবচেয়ে সক্রিয় ও প্রভাবশালী নেতা ছিলেন নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসু, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু প্রমুখ দিকপালগণ। ব্রিটিশ সরকার যখন ১৯৩৯ এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো, তখন ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সর্বাত্মক সংগ্রামে নামার জন্য নেতাজি গান্ধিজীর কাছে আবেদন করেছিলেন, 'এটাই সুবর্ণ সুযোগ! আপনি একটু মতের পরিবর্তন করুন, ইংরেজকে একটা বড় আঘাত হানি।' কিন্তু গান্ধীজি বললেন, 'ইংরেজকে ধ্বংস করে আমরা স্বাধীনতা চাই না- অহিংসা

সংগ্রামের নীতি এ নয়।’ আর পণ্ডিত নেহেরু তার ভাষণে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বললেন, ‘যে সময় ইংল্যান্ড জীবন-মরণ সমস্যায় উপনীত হয়েছে, তখন আইন অমান্য আন্দোলন ভারতের পক্ষে হানিকর’। (অবিস্মরণীয়, লেখক: গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র, পৃষ্ঠা: ১৭)।

এই দীর্ঘ আলোচনার সারকথা হচ্ছে, ইংরেজরা তাদের প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজের মাধ্যমে যে শিক্ষিত শ্রেণিটি সৃষ্টি করেছিল তারা প্রকৃতপক্ষে ছিল প্রভুরাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষাকারী। এদের মাধ্যমেই ইংরেজ দেশকে শাসন ও শোষণ করেছে। তাদের মাধ্যমেই জাতিকে বহু রাজনৈতিক ভাগেও বিভক্ত করে দিয়ে গেছে। যেমন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ। একদল হিন্দুকেন্দ্রিক, আরেকদল মুসলিমকেন্দ্রিক। ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে যেন জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করতে না পারে সেজন্য নিজেদের সৃষ্টি করা রাজনীতির মঞ্চেও সাম্প্রদায়িক বিভেদ তারা তৈরি করে রেখেছে। এই দু’টি দল একে অপরের বিরুদ্ধে বহু মারামারি করেছে, হিংসা-বিদ্বেষ ছড়িয়েছে, ধর্মীয় দাঙ্গা বাঁধিয়েছে। শেষ পর্যন্ত এই দু’টি দলই ভারতকে পাকিস্তান ও ভারত দু’টি ভাগে ভাগ করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। অবশেষে ইংরেজরা এই শিক্ষিত (অথবা প্রশিক্ষিত) শ্রেণির হাতেই ভারত ও পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা দিয়ে বিদায় নেয়। তাদের বিদায় নেওয়ার বড় কারণ ছিল, ভারতবর্ষে লুটপাট করার মত আর কোন সম্পদ অবশিষ্ট ছিল না। আবার দু-দু’টি বিশ্বযুদ্ধ করে ইংল্যান্ড যথেষ্ট শক্তিহীনও হয়ে পড়েছিল। তাই তারা আর কষ্ট করে অনুর্বর, অনুৎপাদনশীল উপনিবেশটি ধরে রাখতে চায় নি। তারা চলে গেলেও শিক্ষিত শ্রেণিটিকে তাদের প্রতিনিধির আসনে বসিয়ে গেছে যারা আজও পশ্চিমা প্রভুদেরই স্বার্থরক্ষা করে চলেছে, তাদের অঙ্গুলি হেলনে জীবন কাটিয়ে ধন্যবোধ করছে।

ইহুদিবাদীদের ষড়যন্ত্রের দলিল

১৮৯৭ সনে ইহুদিবাদের (Zionism) অনুসারী চক্রান্ত বিশারদ ইহুদি নেতাগণ সারা দুনিয়ায় তাদের আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের যে এক কর্মসূচি চূড়ান্ত করেন তার নাম The Protocols of the Elders of Zion. পাঠকমাত্রই বইখানা পড়ে বিস্ময়ে হতবাক হতে বাধ্য হবেন এবং এতে চক্রান্তজালের যে কর্মসূচি পেশ করা হয়েছে তা পাঠ করার সময় পাঠক অনুভব করবেন যে, তিনি নিজেও এ ষড়যন্ত্রের নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে আছেন। গত এক শতকের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, পৃথিবীতে যে কয়টি বড় ধরনের ঘটনা বা দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং মানবজাতি যে সঙ্কটের আবর্তে আটকে পড়েছে এর সবই এ বইয়ে ভবিষ্যদ্বাণীর মতো লিপিবদ্ধ রয়েছে। ইহুদি জ্ঞানী ব্যক্তিরা এ বইয়ে গইম অর্থাৎ অ-ইহুদিদের ‘নির্বোধ’ বলে অভিহিত করেছেন। এর একটি অধ্যায়ের নামই Gentiles are stupid. পশ্চিমা সভ্যতার উগ্রতম রূপ কম্যুনিজমের আন্দোলনের মূলে যাদের মন-মগজ কাজ করছে তাদের সকলেই ইহুদি। কম্যুনিজমের জন্মদাতা কার্ল মার্কস মাতাপিতা উভয় দিক থেকেই ইহুদি! লেলিন এবং ট্রটস্কিও ইহুদি বংশেরই সন্তান। লেলিনের দাদা, মা এবং স্ট্যালিনের স্ত্রী ইহুদি ছিলেন। এই কম্যুনিজমের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্বের নেতৃত্ব ইহুদিদের হাতে চলে যায় এবং এখনও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তারাই সকল কিছুর কলকাঠি নাড়ছে।

বিশ্বব্যাপী তাদের শাসন যেন নির্বিঘ্ন হয় এবং সকলে যেন অজান্তেই তাদেরকে সমর্থন করে এই সূত্র মাথায় রেখেই তারা বিশ্বব্যাপী শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তন করার জন্য পরিকল্পনা করে। শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয় তা হলো: ‘‘গইম সমাজকে চিন্তাশক্তিহীন অনুগত পশুর (Unthinking submissive brutes) স্তরে

নামিয়ে আনা যেন তাদের চোখের সামনে কোন কিছু পেশ না করা পর্যন্ত তারা নিজস্ব চিন্তার সাহায্যে কোন ধারণাই পোষণ করতে না পারে।” প্রটোকল পুস্তকের জব-বফঁপধঃরড়হ অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য কিছু অংশের ভাবানুবাদ এখানে তুলে ধরছি:-

ধএকমাত্র ইহুদিদের ছাড়া দুনিয়ার যাবতীয় সমষ্টিগত শক্তি বিনষ্ট করার জন্য প্রথমেই আমরা সমষ্টির শিক্ষা যেখান থেকে আরম্ভ অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এক নবতর শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে বীর্যহীন (Emasculate) করে দেবো। ধরাষ্ট্রের প্রচলিত আইন-কানুন ও রাজনীতি সংক্রান্ত অপরাপর প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীকে আমরা পাঠ্য তালিকার বহির্ভূত করে দেবো যেন তা অবান্তর কল্পনা বিলাসী ও অবাঞ্ছিত নাগরিক (Utopian dreamers and bad subjects) সৃষ্টি করে মাত্র। আমরা যুবসমাজকে শাসন কর্তৃপক্ষের অনুগত সন্তানে পরিণত করবো।

ধআমরা ইতিহাসকে পাল্টে দেব। পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলোর যেসব ঘটনা আমাদের জন্য অবাঞ্ছিত সেগুলোর স্মৃতি মানুষের স্মৃতিপট থেকে মুছে দেবো। শুধু গইম সরকারের ভুল-ভ্রান্তির ইতিহাস তাদের স্মৃতিপটে জাগ্রত করে রাখার ব্যবস্থা করবো।

দাসের শাসন ভয়ঙ্কর

এখন সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে কয়েকটা কথা দরকার। পেছনে বলে এসেছি যে উম্মতে মোহাম্মদীকে সৃষ্টি করা হয়েছিল একটি মাত্র উদ্দেশ্যে এবং তা হলো সর্বাত্মক সংগ্রামের মাধ্যমে এই শেষ দীন, জীবনব্যবস্থা এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা। ঐ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সংগ্রাম শুরু করেও অর্ধেক রাস্তায় দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ ঐ উদ্দেশ্য ভুলে যেয়ে যখন ঐ সংগ্রাম ত্যাগ করলো তখনই এই জাতির অস্তিত্বের আর অর্থ রইলো না। কারণ যে জিনিসের উদ্দেশ্য নেই সেটা অর্থহীন। সেই উদ্দেশ্য অর্জনের সংগ্রাম ত্যাগ করার ফলে এটা আর প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী রইলো না। সম্মুখে উদ্দেশ্য না থাকলে যা হবার এরপর তাই হলো অর্থাৎ নানামতের সৃষ্টি, বিভেদ এবং একদা পরাজিত শত্রুর কাছে পরাজয় ও তাদের ক্রীতদাসে পরিণত হওয়া। ঐ দাসত্বই যথেষ্ট প্রমাণ যে, এই জাতি আর তখন মো’মেনও নয় মুসলিমও নয়, উম্মতে মোহাম্মদী তো নয়ই। কারণ এর যে কোনটা হলেই অন্য জাতির দাসত্ব অসম্ভব, কারণ আল্লাহ বহুবার বলেছেন তিনি মো’মেনের সঙ্গে আছেন, বলেছেন যে মো’মেনদের সাহায্য করা অবশ্য কর্তব্য, দায়িত্ব (কোর’আন-সুরা আর রুম ৪৭)। আল্লাহ যাকে বা যাদের সঙ্গে আছেন, যাদের সাহায্য করছেন তারা যদি দাসে, গোলামে পরিণত হয় তবে একটাই সিদ্ধান্ত সম্ভব আর তা হলো আল্লাহ মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছেন (নাউযুবিল্লাহ)। যা হোক, কয়েক শতাব্দী ঐ দাসত্বের পর বিশেষ অবস্থার কারণে এই জাতি গোলামী থেকে দৃশ্যতঃ ও আংশিকভাবে মুক্তি পেলো। আংশিক কেন বলছি তা পেছনে বলে এসেছি। পাশ্চাত্য প্রভুরা যাবার সময় ক্ষমতা ছেড়ে গেলো তাদেরই অতি যত্নে তৈরি করা একটা শ্রেণির হাতে, যে শ্রেণির মন-মগজ তারা বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষার মাধ্যমে কিনে নিয়েছিল। ক্ষমতা এদের হাতে ছেড়ে যাবার পর এরা বিভিন্ন দেশে যে ধরনের সরকারগুলি কায়েম করলেন তা থেকেই তাদের হীনমন্যতার গভীরতা আঁচ করা যায়। ইউরোপের যে রাষ্ট্রের অধীনে যে দেশ ও এলাকা ছিল সেই সেই দেশের নতুন সরকারগুলি প্রত্যেকটি তাদের যার যার বিগত প্রভুদের দেশের ব্যবস্থা নিজেদের দেশে প্রবর্তন করলো শুধু রাজতন্ত্র ছাড়া। প্রভুরা যে সার্বভৌমত্ব স্রষ্টার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মানুষের হাতে নিয়ে এলো এটা যে স্রষ্টাকে অস্বীকার করে কুফর করা হলো এ বোধ এই

নতুন শাসকদের ছিল না, কাজেই তারা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অস্বীকারকারী ব্যবস্থাগুলি তাদের নিজেদের দেশে প্রবর্তন করেও তারা 'মুসলিমই রইলেন' এই আহাম্মকের স্বর্গে বাস করতে লাগলেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি করতে থাকলেন। তারা তাদের বিগত খ্রিস্টান ইলাহদের (হুকুমদাতা) কাছে শিখেছিলেন যে আল্লাহ এবং তাঁর দীন নেহায়েত ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে মানলেই ভালো ধার্মিক হওয়া যায়। জাতীয় জীবনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক এসব জটিল ব্যাপার বোঝা আল্লাহর বুদ্ধির বাইরে। তাদের ঐ ধর্মনিরপেক্ষতার শিক্ষা ঐ ক্ষমতাধারীদের পক্ষে গ্রহণ ও প্রয়োগ করা কঠিন হলো না, কারণ এই 'ধর্মের' ধারক-বাহক ধ্বজাধারী যারা ছিলেন ও আছেন তারা বিশেষ কোন বাধা দিলেন না। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অস্বীকারকারী ঐ পাশ্চাত্য রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাগুলি এই বিভিন্ন 'মুসলিম' দেশগুলিতে চালু করার বিরুদ্ধে ঐ 'ধর্মীয়' নেতারা যারা নিজেদের 'ওলামায়ে দীন' বলে মনে করেন তারা অপ্রতিরোধ্য বাধা হয়ে দাঁড়ান নি তার কারণ-

ক) পূর্ববর্তী ফকীহ মোফাস্সেরদের কাজের ফলে অর্থাৎ এই দীনের অতি বিশ্লেষণের ফলে ঐ ওলামায়ে দীন বহু ভাগে বিভক্ত হয়েছিলেন। আর এটা সাধারণ জ্ঞান যে ঐক্যহীন কোন কিছুর কোন শক্তি নেই।

খ) ঐ 'ওলামায়ে দীনের' আকিদাও পাশ্চাত্য খ্রিস্টানদের ধর্মনিরপক্ষতার মতই ছিল, অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ রাসুলে ঈমান, নামাজ, রোজা ইত্যাদি করলেই ভালো মুসলিম হওয়া যায়, জাতীয় জীবনে গোলমালে যেয়ে কি হবে? এই দিক দিয়ে মোশরেক ও কাফের পাশ্চাত্য জাতিগুলির আকিদার থেকে এরা বেশি দূরে ছিলেন না এবং এখনও নেই। পেছনে যে অন্তর্মুখীতার কথা বলে এসেছি এটা তারই ফল।

গ) যখন পাশ্চাত্য প্রভুদের হাত থেকে ক্ষমতা ঐ 'শিক্ষিত' শ্রেণিটির কাছে হস্তান্তরিত হলো তখন বৃহত্তর জনসাধারণ শুধু অশিক্ষিত ও নিরক্ষর নয় মূর্খ। কয়েক শতাব্দী আগেই এই জাতিকে গণ্ডমূর্খে পরিণত করার যে প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল তার পূর্ণ ফসল এখন দেখা দিয়েছে। এই অশিক্ষার ও মূর্খতার সর্বপ্রধান কারণ ছিল এই দীনের 'ওলামাদের' অতিবিশ্লেষণ ও শেষ পর্যন্ত এই অভিমত যে ধর্মীয় শিক্ষাই একমাত্র শিক্ষা, ধর্মীয় জ্ঞানই একমাত্র জ্ঞান, এর বাইরে আর কোন শিক্ষা আর কোন জ্ঞান প্রয়োজন নেই। সুতরাং যখন ক্ষমতা হস্তান্তর হলো তখন ঐ 'শিক্ষিত' শ্রেণির বাইরে প্রধান মাত্র দু'টি ভাগ ছিল একটি 'ওলামায়ে দীন' যাদের জাতীয় জীবন সম্বন্ধে আকিদা ইসলামের আকিদা নয়, পাশ্চাত্য খ্রিস্টানদের শেখানো, ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। অন্যটি বিরাট অশিক্ষিত নিরক্ষর জনতা। কাজেই 'শিক্ষিত' ক্ষমতাধর শ্রেণিটি বিনা বাধায় পাশ্চাত্যের কাছে শেখা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব তওহীদ অস্বীকারকারী জাতীয় জীবনব্যবস্থা সমস্ত 'মুসলিম' দুনিয়াময় প্রতিষ্ঠা করতে পারলেন।

এই কালো, বাদামী ও হলদে ইউরোপিয়ানদের শাসন এখনও পর্যন্ত চলছে। কিন্তু যেদিন এদের শাসন আরম্ভ হয়েছিল সেদিন থেকে আজ কিছুটা ব্যতিক্রম এসেছে। এই ব্যতিক্রম দু'মুখী এবং বিপরীতমুখী।

ক) বিদেশি প্রভুরা কেরানিকূল সৃষ্টির জন্য যে নৈতিকতাহীন শিক্ষা ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছিল সেই ব্যবস্থা মাছিমারা কেরাণীর মত অনুকরণ করার ফলে চিন্তা-ভাবনা দৃষ্টিভঙ্গি (আকিদা) সংস্কৃতি, ইত্যাদি ব্যাপারে এই জাতির দেশগুলি আজ অনেক বেশি পাশ্চাত্য নির্ভর। যেদিন পাশ্চাত্য জাতিগুলি প্রাচ্যের এই দেশগুলিকে তথাকথিত স্বাধীনতা দিয়ে চলে গিয়েছিল সেদিনের চেয়ে এই দেশগুলিতে নিজেদের ঘরে নিজেদের মধ্যে অনেক বেশি ইংরেজীতে, ফ্রেঞ্চে, জার্মানে, ইটালিয়ানে কথা বলে, যে কয়টি ঘরে পাশ্চাত্য সঙ্গীত বাজতো আজ তার চেয়ে বহু বেশি ঘরে বাজে। অর্থনৈতিক দিকটা পরে আসছে।

খ) অন্যদিকে এই দেশগুলিতে মানুষের মধ্যে একটা অংশের চেতনা ফিরে আসছে, কালঘুম ভাঙছে। মহানবী (দ:) বলে গেছেন- আমার উম্মাহর মধ্যে চিরকালই একটা দল থাকবে যারা সর্ব অবস্থায় আল্লাহর আদেশ-নিষেধ বলবৎ করবে [হাদীস- মুয়াবিয়া (রা:) থেকে বোখারী, মুসলিম, মেশকাত]। আল্লাহর আদেশ- নিষেধ অর্থই এই জীবন-ব্যবস্থা, এই দীন উল হক ইসলাম। এরা বহুভাগে বিভক্ত হলেও, ইসলাম সম্পর্কে এদের মধ্যে ধারণা বিকৃত হলেও ইসলামের বিধান জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের একটা চাপ কমবেশি চিরকাল আছে, পাশ্চাত্য প্রভুরা থাকতেও ছিল। তারা চলে যাবার পর এই চাপ ক্রমশঃ বাড়ছে। এদেরই চাপে ক্ষমতাধর শাসকরা সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কিছুটা আপোষের ভাব দেখাচ্ছেন। যদিও আসলে আপোসের চেয়ে ফাঁকি দেয়ার উদ্দেশ্যটাই মুখ্য। সাবভৌমত্ব ছাড়া কোন ব্যবস্থা, বিধান, জীবনব্যবস্থা অসম্ভব। কারণ যে কোন সমস্যারই একটা শেষ চূড়ান্ত স্থান থাকতে হবে সমাধানের। না থাকলে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বিভেদ-বিভক্তি ও সমস্ত ব্যবস্থাটাই ভেঙ্গে পড়া। খ্রিস্টান ধর্মে জাতীয় জীবনের কোন ব্যবস্থা নেই, তাই খ্রিস্টান জগত জাতীয় জীবন পরিচালনার জন্য জন্ম দেয় ধর্মনিরপেক্ষতার। এই জীবনব্যবস্থাতেও কোনো না কোনো সার্বভৌমত্ব রাখতে হলো। প্রথমতঃ রাজাদের তারপর সেটার ব্যর্থতার পর বিভিন্ন প্রকারের সার্বভৌমত্বের। পরিষ্কার করে উপস্থাপন করতে গেলে এমনি করে করতে হয়:

ব্যবস্থা (System)	সার্বভৌমত্ব (Sovereignty)
রাজতন্ত্র	রাজা, বাদশাহ, সম্রাট
গণতন্ত্র	জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা
সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ	জনসাধারণের একটি বিশেষ শ্রেণি
ফ্যাসিবাদ	এক নায়ক, ডিকটেটর
ইসলাম	আল্লাহ

এই বিন্যাসই এ কথা পরিষ্কার করে দিচ্ছে যে সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কোন আপোস সম্ভব নয়। ওপরের যে কোন একটাকে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে বাদ দিয়ে অন্য যে কোনটি স্বীকার, গ্রহণ করে নিলে সে আর মুসলিম বা মো'মেন থাকতে পারে না। কোন লোক যদি ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহ বিশ্বাসী এবং জাতীয় জীবনের ওপরের যে কোনটায় বিশ্বাসী হয় তবে সে মোশরেক। আর উভয় জীবনের কোন লোক যদি ঐগুলির যে কোনটায় বিশ্বাস করে তবে সে কাফের।

এই রঙ্গীন (Coloured) ইউরোপিয়ানদের শাসন দু'এক দশক পার হবার মধ্যেই আল্লাহর রহমে বিভিন্ন মুসলিম দেশগুলোয় কিছু কিছু মানুষ সচল হয়ে উঠতে লাগলো। এদের জাগরণের প্রেরণা এলো সেই দলের লোকদের কাছ থেকে যাদের সম্বন্ধে একটু আগেই বলে এসেছি। যাদের কথা বিশ্বনবী (দ:) বলে গেছেন- আমার উম্মাতে সব সময়ই একদল লোক থাকবে যারা নিরবচ্ছিন্নভাবে এই দীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাবে। যাই হোক, ক্রমশঃ এই দীনকে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য, পাশ্চাত্য প্রভুদের শেখানো আত্মাহীন বস্তুতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ত্যাগ করার জন্য চাপ বাড়তে লাগলো এবং এমন একটা পরিস্থিতি এলো যখন মানসিকভাবে পাশ্চাত্যের দাস, বিভিন্ন মুসলিম দেশের নেতৃত্ব দেখলো যে একটা কিছু করা দরকার। তারা করলেনও। অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত

জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য তারা ইসলামিক ধনতন্ত্র, ইসলামিক সমাজতন্ত্র, ইসলামিক রাজতন্ত্র ইত্যাদি অদ্ভুত অসম্ভব ব্যবস্থা সৃষ্টি করলেন। উদ্দেশ্য মানুষকে ফাঁকি দেওয়া হলেও তারা নিজেরাই এ কথা বুঝলেন কিনা জানি না যে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের সঙ্গে ঐ সব ব্যবস্থার সার্বভৌমত্বের গোজামিল হচ্ছে শেরক ও কুফর। যদি বুঝে থাকেন তবে এ কথা পরিষ্কার যে পাশ্চাত্য প্রভুদের শেখানো আল্লাহ বিরোধী ব্যবস্থাগুলিকে টিকিয়ে রাখার জন্য তারা নিজেদের জাতিকে ধোঁকা দিচ্ছেন, তারা শেরক ও কুফরের মধ্যে তো আছেনই, তার উপর তারা জ্ঞানপাপী। আর যদি না বুঝে থাকেন তবেও এ কথা পরিষ্কার যে তাদের মন-মগজ পাশ্চাত্যের সব কিছু সম্বন্ধে এতো অতল হীনমন্যতায় নিমজ্জিত, পাশ্চাত্য সব কিছুতেই নির্ভুল এই বিশ্বাস এতো দৃঢ় যে গত মহাযুদ্ধে যদি গণতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীরা না জিতে ফ্যাসিবাদী অক্ষশক্তি জিতে যেতো এবং পৃথিবীতে তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতো তবে শেরক ও কুফরের দাস 'মুসলিম' দেশগুলির শিক্ষিত শাসক শ্রেণি ইসলামিক ফ্যাসিবাদ আবিষ্কার করে তা তাদের জাতিগুলির উপর চাপাতেন এবং গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদকে তেমনি গালিগালাজ করতেন আজ যেমন ফ্যাসিবাদ আর রাজতন্ত্রকে করেন। পাশ্চাত্য সম্বন্ধে ঘৃণ্য হীনমন্যতায় অন্ধ হয়ে না গেলে এরা দেখতে পেতেন যে ইসলামিক গণতন্ত্র, ইসলামিক সমাজতন্ত্রের চেয়ে বরং ইসলামিক খ্রিস্টান, ইসলামিক হিন্দু, ইসলামিক বৌদ্ধ, ইসলামিক ইহুদি নিকটতর কারণ এরা সবার উপর স্রষ্টা আছেন বিশ্বাস করে এবং তাকে প্রভু বলে স্বীকার করে। কিন্তু গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ স্রষ্টাকে বিশ্বাসই করে না, ব্যক্তিগতভাবে মুখে কেউ করলেও পার্থিব অর্থাৎ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি ব্যাপারে আল্লাহর কিছু বলার আছে বলে স্বীকার করে না।

বর্তমানে 'মুসলিম' দুনিয়ার নেতৃত্ব তাদের সীমাহীন হীনমন্যতায় তাদের যার যার জাতিগুলিকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন তা একবার দেখা দরকার। এরা তাদের প্রকৃত ইলাহ অর্থাৎ জাতীয় জীবনের ইলাহ পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিক জুডিও খ্রিস্টান সভ্যতার কাছ থেকে শিখেছেন যে পার্থিব, অর্থনৈতিক উন্নতিই হচ্ছে মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। একে এরা নাম দিয়েছেন জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন। পাশ্চাত্যের মানুষের দর্শন হচ্ছে কঠিন পরিশ্রম করে যত পার উপার্জন কর, ঐ উপার্জনের টাকায় যতখানি পার জীবন উপভোগ কর, তারপর আয়ু ফুরিয়ে গেলে মরে যাও। প্রাচ্যের বর্তমান নেতৃত্ব তাদের শিক্ষকের কাছ থেকে জীবনের ঐ দর্শন খুব ভালো করেই শিখেছেন, তাদের দৃষ্টিতে মানব জীবনের উন্নতির একটি মাত্র অর্থ আছে আর তা হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নতি। এটা শুধু তথাকথিত মুসলিম নেতৃত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। পাশ্চাত্য সামরিক শক্তিতে প্রাচ্যের যত দেশই জয় করেছিল, সর্বত্রই তাদের শিক্ষা ব্যবস্থার বদৌলতে জীবনের ঐ বস্তুতান্ত্রিক দর্শন প্রতিষ্ঠা করেছে। মো'মেন জাতির জীবনের উদ্দেশ্য যে জীবন উপভোগের উল্টো, অর্থাৎ মানুষজাতির সমস্ত অন্যায়, রক্তপাত, যুদ্ধ, অশান্তি বন্ধ করে শান্তি (ইসলাম) স্থাপন করে এবলিসের চ্যালেঞ্জে আল্লাহকে জয়ী করার জন্য নিজেদের কোরবানি করা তা ঐ হীনমন্যতায় অন্ধ নেতৃত্বের মগজে প্রবেশ করে না। কারণ নিজেদের জীবন-ব্যবস্থায়, দীনের শুধু প্রক্রিয়ার ভাগ, তাও শুধু ব্যক্তিগত প্রক্রিয়ার ভাগটা অর্থাৎ নামাজ, রোজা, ইত্যাদি ছাড়া আর কিছুই তারা জানেন না। এই জাতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী সে সম্বন্ধে তাদের অজ্ঞতা পরিপূর্ণ। মুখে লা ইলাহা এল্লাল্লাহ বলে, আল্লাহর সরাসরি হুকুম, আদেশগুলিকে অবজ্ঞাভরে দূরে ফেলে দিয়ে সেখানে পাশ্চাত্য প্রভুদের নির্দেশকে কার্যকরী করে তারা তাদের নিজেদের দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নতির, 'জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের' জন্য উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছেন। পারছেন না। শুধু যে পারছেন না তাই নয়। পাশ্চাত্য প্রভুরা তাদের শাসন ও শোষণ করার পর তাদের সৃষ্ট তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী শ্রেণিটির হাতে ক্ষমতা ছেড়ে যাবার সময় এই দেশগুলির যেটুকু অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ছিল, আজ

৪০/৫০ বছর পর সেটুকুও অবশিষ্ট নেই। সেদিন যতলোক অর্ধাহারে, অনাহারে থাকতো আজ তার চেয়ে বেশি স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে অর্ধাহারে, অনাহারে থাকে। পাশ্চাত্য প্রভুরা চলে যাবার দিন এই দেশগুলির উপর কোন ধার কর্জ ছিল না। আজ পাশ্চাত্যের কাছে ঋণ, ধার-কর্জে এদের হাড়গোড় পর্যন্ত দায়বদ্ধ হয়ে গেছে এবং ঐ বিরাট ঋণ শোধ দেবার ক্ষমতা বহু পূর্বেই শেষ হয়ে গেছে। মাঝখান থেকে আত্মার ও চরিত্রের যেটুকু পরিচ্ছন্নতা ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে তাও হারিয়ে গেছে। পাশ্চাত্য প্রভুরা চলে যাবার দিনটির চেয়ে প্রতিটি তথাকথিত মুসলিম দেশে অন্যায়, খুন-জখম, রাহাজানি, ব্যভিচার, ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি আজ বহুগুণ বেশি এটা যে কোন পরিসংখ্যান দেখলেই দেখা যাবে। প্রত্যেকটি জাতির নৈতিক চরিত্র আজ অধঃপতিত। তাহলে নেতৃত্ব এই দেশগুলিকে কি দিলেন? চরিত্র, আত্মা বিক্রী করে দিয়ে যদি অর্থনৈতিক উন্নতি, তাদের ভাষায় জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করতে পারতেন, তবু না হয় এরা কিছু বলতে পারতেন, (যদিও মুসলিম জাতি তা পারে না) কিন্তু তাও তো পারেন নি। দু'টোই তো অধঃগামী, নিম্নমুখী। এই নেতৃত্ব চোখ-কান বুঁজে তাদের দেশে পাশ্চাত্যের অনুকরণে কল-কারখানা বসাচ্ছেন, ফ্যাক্টরি চালু করছেন, কৃষিব্যবস্থা উন্নত করার জন্য ট্র্যাক্টর আমদানি করছেন। কারণ তাদের প্রভুদের কাছে থেকে তারা শিখেছেন যে কল-কারখানা, ফ্যাক্টরিই হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নতির একমাত্র উপায়। ঐ উপায়ে অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টায় তারা স্বভাবতঃই প্রভুদের সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে যার যার দেশে চালু করেছেন। যেহেতু পাশ্চাত্য প্রভুরাই এই নেতৃত্বের আসল অর্থাৎ জাতীয় জীবনের প্রভু, ইলাহ তাই অন্য ইলাহ অর্থাৎ আল্লাহর সরাসরি হুকুম- "তোমরা সুদ খেয়ো না" (কোর'আন- সুরা আল বাকারা ২৭৫, সুরা আল ইমরান ১৩০) অর্থাৎ জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে সুদকে হারাম করে দেওয়াটা তাদের কাছে কোন চিন্তার বিষয়ই নয়। পাশ্চাত্য প্রভুরা যেটাকে ঠিক বলেছেন, কবেকার সেই পুরোনো আল্লাহ নিষেধ করলেই তা বাদ দিবেন এমন অশিক্ষিত বোকা 'মুসলিম' তারা নন।

এই যে তথাকথিত মুসলিম দেশগুলির বর্তমান নেতৃত্বের করুণ ব্যর্থতা, এই যে ঈমান, চরিত্র, আত্মা বিকিয়ে দিয়েও হাড্ডি-গোশত পর্যন্ত ঋণে দায়বদ্ধ হয়েও পার্থিব সম্পদ লাভের ব্যর্থতা, এই হচ্ছে 'মুসলিম' বিশ্বের মোশরেক ও কাফের নেতৃত্বের নেট ফল। প্রশ্ন হতে পারে বস্তুতান্ত্রিক পাশ্চাত্য জগত ঐ কল-কারখানা, ফ্যাক্টরি ইত্যাদি দিয়েই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সফল হলো কেন? এর জবাব হচ্ছে: পাশ্চাত্য জাতিগুলি তাদের ভৌগোলিক রাষ্ট্রে (Nation State) বিশ্বাসী এবং ঐ ভৌগোলিক রাষ্ট্রের স্বার্থকে তাদের অধিকাংশ মানুষ তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের উপর স্থান দেয়। আমার লাভ হবে কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষতি হবে এমন কাজ তাদের অধিকাংশ লোকেই করবে না। তাদের বিদ্যালয়, স্কুল-কলেজে ছোট বেলা থেকেই কতকগুলি বুনিয়াদী শিক্ষা এমনভাবে তাদের চরিত্রের মধ্যে গেঁথে দেওয়া হয় যে, তা থেকে কিছু সংখ্যক অপরাধী চরিত্রের লোক ছাড়া কেউ মুক্ত হতে পারে না। ফলে দেখা যায় যে ওসব দেশের মদখোর, মাতাল, ব্যভিচারীকে দিয়েও তার দেশের, জাতির ক্ষতি হবে এমন কাজ করানো যায় না, খাওয়ার জিনিসে ভেজাল দেওয়ানো যায় না, মানুষের ক্ষতি হতে পারে এমন জিনিস বিক্রি করানো যায় না ইত্যাদি। পক্ষান্তরে প্রাচ্যের এই 'মুসলিম' দেশগুলির নেতৃত্ব এখনও সেই ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু রেখেছেন, যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল একটি কেরানি শ্রেণি সৃষ্টি করা, প্রভুদের শাসনযন্ত্রকে চালু রাখার জন্য। সে শিক্ষা ব্যবস্থায় লেখাপড়া, ভাষা, অংক, ভূগোল, কিছু বিজ্ঞান, কিছু বিকৃত ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হতো। কিন্তু চরিত্র গঠনের কোন শিক্ষা তাতে ছিল না এবং আজও নেই। কাজেই, স্বভাবতঃই পাশ্চাত্যের শিক্ষালয়গুলির ছাত্র-ছাত্রীরা সুশৃঙ্খল, প্রাচ্যের উচ্ছৃঙ্খল, সেখানে লেখাপড়া হয়, এখানে রাজনীতি, ছুরি মারামারি, গোলাগুলি হয়, পাশ্চাত্যের শিক্ষালয়গুলি থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা একটা চরিত্র নিয়ে বের হয় প্রাচ্যের ছাত্র-ছাত্রীরা

চরিত্রহীন হয়ে বের হয়। এরা যখন সরকারি, বেসরকারি চাকরিতে যোগ দেয়, রাজনৈতিক নেতৃত্ব লাভ করে তখন স্বভাবতঃই প্রাচ্য-পাশ্চাত্য কোন আদর্শ দিয়েই পারিচালিত হয় না। রাষ্ট্রের স্বার্থকে নিজের স্বার্থের ওপরে স্থান দেওয়ার পাশ্চাত্য শিক্ষা পায়নি বলে রাষ্ট্রের ক্ষতি করেও নিজের স্বার্থ উদ্ধার করে। অন্যদিকে ইসলামের শিক্ষা পায় নি বলে ঘুষ খায়, মিথ্যা বলে, ইসলামের যা কিছু আছে তার বিরুদ্ধাচারণ করে। কাজেই পাশ্চাত্য যা করে সফল, প্রাচ্য তাই করতে যেয়ে ব্যর্থ। এই নেতৃত্ব মাছিমারা কেরানির মত (প্রভুদের কেরানিকূল সৃষ্টির শিক্ষাব্যবস্থা কতখানি সফল হয়েছিল, তার প্রমাণ এইখানেই) পূর্ব প্রভূদের এমন নিখুঁত অনুকরণ করেন যে কোন কোন ক্ষেত্রে তা করুণ হয়ে দাঁড়ায়। এর মাত্র একটা এখানে আলোচনা করছি। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা (ভৌগোলিক রাষ্ট্র নয়) রাষ্ট্র প্রধান অর্থাৎ খলিফা রাষ্ট্র থেকে ভাতা পাবেন একজন সাধারণ মানুষের প্রয়োজন মোতাবেক, অর্থাৎ জীবনের মৌলিক প্রয়োজন, খাবার, কাপড়, বাসস্থান ইত্যাদি। কোন বিলাসিতা, আড়ম্বর, কোন জাঁক-জমকের জন্য রাষ্ট্র খরচ বহন করবে না। প্রকৃত ইসলামের যুগে খলিফারা এর বেশি পান নি। মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে বাসস্থানটাও তারা পান নি। কারণ খলিফা হবার আগে তাদের নিজেদের যে বাড়ি ছিল তারা তাতেই থাকতেন এবং তা প্রায় কুঁড়েঘরের পর্যায়ের ব্যাপার ছিল। তারপর উম্মতে মোহাম্মদী যখন তাদের নেতার (দ:) আরদ্ধ কাজ করতে করতে আটলান্টিকের সমুদ্রতট থেকে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত এই জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করলো তখন পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি হয়ে দাঁড়ালো এই উম্মাহ, তখনকার দিনের বিশ্বশক্তি (ঝঁড়বৎ চড়বিৎ)। সামরিক ও অর্থনৈতিক এই উভয় দিক দিয়ে এই উম্মাহর সামনে দাঁড়াবার মত তখন পৃথিবীতে আর কেউ নেই। তদানীন্তন দুটো বিশ্ব শক্তিকে এই উম্মাহ, ইতোমধ্যেই পরাজিত করে দিয়েছে। একটি বিশ্বশক্তি এই উম্মাহর অন্তর্ভুক্তই হয়ে গেছে (পারস্য)। কিন্তু খলিফাদের ভাতা ঐ-ই রইলো। আলী (রা:) পর্যন্ত এই মহাশক্তির নেতারা তালি দেওয়া কাপড় পড়ে, অর্ধাহারে থেকে, কুঁড়ে ঘরে বাস করে এই মহাশক্তির নেতৃত্ব করে গেছেন। কিন্তু ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির দাসত্বের পর আবার যখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়া গেলো তখন এই জাতির নেতৃত্ব বাদরের মত প্রভুদের সব কিছু অনুকরণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের নেতাদের অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, আইন সভার সদস্যদের মত মহা জাঁকজমক, চাকচিক্য ও বিলাসিতাও অনুকরণ করতে লাগলো। এই অন্ধ অনুকরণের প্রাণান্তকর প্রয়াসে এরা এটুকু ও বুঝলেন না যে যাদের অনুকরণ করতে চেষ্টা করছেন তারা বিরাট ধনী, তারা পৃথিবীটাকে কয়েক শতাব্দী ধরে শোষণ করে সম্পদের পাহাড়ে বসে আছে, তারা মহা শক্তিমান, তাদের ঐ আড়ম্বর, জাঁকজমক, বিলাসিতা সাজে, এদের সাজে না, হাস্যকর। এরা অভুক্ত, অর্ধভুক্ত, আধমরা, হাড্ডিসার জাতিগুলির নেতা।

না বুঝলেও তারা ক্ষান্ত হলেন না। পূর্ব প্রভুদের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীরা যেমন সুসজ্জিত প্রাসাদে বাস করেন এরাও তাই করতে লাগলেন। তাদের আইন পরিষদের সদস্যরা যে মানের জীবন-যাপন করে তাই করতে লাগলেন। পাশ্চাত্য দেশগুলির জনসাধারণ এই শোষিত জনগণের চেয়ে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বহু উপরে। তাদের পক্ষে তাদের সরকারের ঐ জাঁকজমক জোগান দেয়া কঠিন নয়। কিন্তু প্রাচ্যের গরীব জনসাধারণ, যাদের পরনের কাপড় নেই, পেটে খাবার নেই, তাদের পক্ষে তা অসম্ভব। কিন্তু ঐ অসম্ভবকেই তাদের সম্ভব করতে হচ্ছে আরও না খেয়ে থেকে, আরও উলঙ্গ থেকে। আগে না খেয়ে টাকা যোগাত বিদেশি প্রভুদের, এখন আরও না খেতে থেকে কর দেয় নিজেদের নির্বাচিত সরকারকে। বিদেশি প্রভুদের যত কর দিতো, আজ নিজেদের নেতাদের জাঁকজমক, আড়ম্বর বজায় রাখতে তার চেয়ে অনেক বেশি কর দেয়। দেশি নেতাদের পাশ্চাত্যের ঠাট নকল করাও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সেই সঙ্গে গরীব জনসাধারণের উপর করের বোঝাও বাড়ছে। হীনমন্যতায় অন্ধ প্রাচ্যের এই জাতিগুলির নেতৃত্ব এ কথা বুঝতে অসমর্থ যে নিজস্ব সত্ত্বা বিসর্জন দিয়ে অন্যের অন্ধ অনুকরণ যারা করতে

চায় তাদের এটাও হয় না, ওটাও হয় না, তাদের একূল-ওকূল দু'কূলই যায়। তাই তাদের গেছে। পাশ্চাত্যের মত অর্থনৈতিক উন্নতি, তাদের ভাষায় জীবন যাত্রার মান উন্নতি হয়নি, মাঝখান থেকে বিরাট ঋণে পাশ্চাত্যের কাছে বাধা পড়ে গেছে প্রায় প্রত্যেকটি জাতি, দেশ। অন্যদিকে প্রাচ্যের জাতিগুলির যেটুকু নৈতিক চরিত্র গোলামী, দাসত্ব করার পরও অবশিষ্ট ছিল তাও শেষ হয়ে আসছে। একই কারণে প্রশাসনিক ব্যাপারেও একই করুণ ব্যর্থতা। যারা দাসত্বের সময়ের প্রশাসন দেখেছেন তাদের বলতে হবে না, আর যারা দেখেনি তাদের জ্ঞাতার্থে বলা প্রয়োজন যে, জনজীবনের নিরাপত্তা, শান্তি, শৃঙ্খলায় ঐ দাসত্বের যুগ এমন ছিল যে অনেকের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে যে এ স্বাধীনতার চেয়ে ঐ দাসত্বই ভালো ছিল। নেতৃত্বের এই নকল করার প্রচেষ্টার ফল এই হয়েছে যে প্রাচ্যের দেশগুলি জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে নিম্নগামী, অধঃগামী। উর্ধগামী শুধু তিনটি ক্ষেত্রে, জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে, অপরাধে, খুন-জখম ইত্যাদিতে আর পাশ্চাত্যের কাছে ঋণের, ধারের অংকের পরিমাণে।

প্রাচ্যের বিশেষ করে 'মুসলিম' দেশগুলির নেতৃত্ব এই যে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছেন ইউরোপ, আমেরিকার মত শুধু পার্থিব সম্পদের পেছনে, এদের সঙ্গে আছে সেই 'শিক্ষিত' শ্রেণিটি যেটি ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত, অর্থাৎ যারা নিজেদের সম্বন্ধে অজ্ঞ, কাজেই বিগত প্রভুদের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় পূর্ণ বিশ্বাসী। যে বিরাট ভাগটা নিরক্ষর, অশিক্ষিত, প্রায় পশু পর্যায়ের সেটার নেতাদের নীতি সম্বন্ধে স্বভাবতঃই কোন বক্তব্য নেই। বাকি রইলো 'ধর্মের' ধ্বজাধারী টুপি, পাগড়িওয়ালা শ্রেণিটি। বিভিন্ন ভৌগোলিক রাষ্ট্রে এই শ্রেণির লোক খুব কম নয়। যার যার দেশে এরা একত্র হয়ে চাপ সৃষ্টি করলে ঐ অন্ধ নেতৃত্ব বাধ্য হতো তাদের নকল করা ছাড়তে। তা হচ্ছে না, হয়ত হবেও না। কারণ পেছনে বলে এসেছি ফকিহ ও মুফাসসিরদের বিশ্লেষণ ও ভারসাম্যহীন বিকৃত সুফীবাদের সম্মিলিত কাজের ফলে ধর্মের ঐ ধারক-বাহক শ্রেণিটি প্রথমতঃ তুচ্ছ, অপ্রয়োজনীয় ফতোয়া দিয়ে একে অপরের পেছনে লেগে আছেন, কোন্দল করছেন, ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোন কাজ এদের দিয়ে সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ আকিদা সম্পূর্ণভাবে বিকৃত হবার ফলে এরা অন্তর্মুখী, নিজেদের নিয়েই এরা অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন। মানসিকভাবে পাশ্চাত্যের দাস নেতৃত্ব তাদের জাতিকে কোন গহ্বরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তা তাদের কাছে কোন প্রয়োজনীয় ব্যাপারই নয় এবং তা বোঝার শক্তিও নেই। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবে এরা এবং জনসাধারণ একথা বুঝতে অক্ষম যে ঐ নেতৃত্ব জাতিকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছে তাদেরও ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সেখানেই যেতে হবে, অন্য কোথাও তারা যেতে পারবে না। উট পাখির মত বালুতে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে তারা বাঁচবেন না। যদি নিজেদের জীবন কোন মতে কাটিয়ে যেতেও পারেন, তাদের পরবর্তী বংশধর, তাদের ছেলেমেয়েরা পারবে না। তারা শিক্ষা, সমাজ ও জীবন ব্যবস্থার চাপে শুধু যে ইসলাম থেকে বাইরে চলে যাবে তাই নয়, তারা ইসলাম বিরোধী হয়ে দাঁড়াবে। তারা যদি সন্দিহান হন তবে তাদের নিজেদের ছেলে-মেয়েদের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখুন। আল্লাহ যদি তাদের চোখের দৃষ্টি ও বোধশক্তি সম্পূর্ণভাবে হরণ না করে নিয়ে থাকেন তবে তারা দেখতে পাবেন জাতীয় জীবনে ইসলাম না থাকলে তাদের আগামী বংশধররাও মুসলিম থাকবে না। বর্তমান দেখে যদি বুঝতে না পারেন তবে নিজের জাতির ইতিহাসের দিকে একবার তাকান, বুঝতে চেষ্টা করুন এই জাতি, উম্মাহ, যাকে আল্লাহ নিজে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলে বলেছেন সেই জাতিটা কেন অন্য জাতির ঘৃণ্য ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছিল কয়েক শতাব্দীর জন্য। তাজাকিস্তান, আজারবাইজান, তাশখন্দ, বোখারা, সমরকন্দ এই সমস্ত মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় বহু বড় বড় আলেমে দীন ছিলেন, পৃথিবীর অন্য কোন স্থানের চেয়ে ঐ বিরাট এলাকায় 'ইসলাম' কম ছিল না। কিন্তু এখনকার মত সেই অন্তর্মুখী। কমিউনিস্টরা যখন জাতির মধ্যে বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে তাদের চিন্তাধারায় পরিবর্তন আনছে তখন ইসলামের ঐ

ধারক বাহকেরা কোর'আন হাদিস নিয়ে গবেষণা করে জ্ঞানগর্ভ বই কিতাব প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখেছেন, মনে করছেন ইসলামের বিরাট খেদমত করছেন, আল্লাহ, রসুল কত খুশি হচ্ছেন। তারপর হঠাৎ একদিন ঘুম ভাঙলো। কিন্তু তখন আর সময় নাই। হাজারে হাজারে প্রাণ দিয়েও আর ইসলামকে রক্ষা করতে পারলেন না। তখন বেশি দেরি হয়ে গেছে। আজ রাশিয়ার ঐসব বিখ্যাত ওলামায়ে দীনের বংশধররা কট্টর নাস্তিক, কমিউনিস্ট। সেই পাক্কা দীনদার সাধারণ মুসলিম ও ওলামায়ে দীনের বংশধররা নাস্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে আল্লাহ, রসুল আর ইসলামের কথা শুনলে বিদ্রুপের হাসি হাসে। খেলাফতের আসন তুর্কী দেশে কামাল পাশা যখন এই উম্মাহর ঐক্যের শেষ যোগসূত্র খেলাফতটাকে ধ্বংস করে দিলো তখন ঐ দেশে লক্ষ লক্ষ ওলামায়ে দীন, মাশায়েখ, জনসংখ্যার প্রায় একশ ভাগ 'মুসলিম'। সেই একই কারণ। ফকীহ মোফাস্সেরদের আর ভারসাম্যহীন বিকৃত সুফীবাদের সম্মিলিত কাজের ফল আকিদার বিকৃতি ও অন্তর্মুখীতা। আকিদার ঐ বিকৃতি ও অন্তর্মুখীতা সমস্ত মুসলিম দুনিয়ায় আজও ঐ রকমই আছে। রাশিয়ার আর তুর্কীর মুসলিমদের মত বাকি দুনিয়ার মুসলিম ও ওলামায়ে দীন, মাশায়েখরাও পার পাবেন না, বাঁচতে পারবেন না, যদি আজও তারা উট পাখির মত বালুতে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে ভাবেন যে, আমি যখন কাউতে দেখতে পাচ্ছি না কাজেই আমাকেও কেউ দেখতে পাচ্ছে না। এই অন্তর্মুখী দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ আকিদা আল্লাহ ও রসুল (দ:) এর চরম ঘৃণার বস্তু। এখানে শুধু এইটুকু বলে যাচ্ছি যে, এই অন্তর্মুখীতা বিশ্বনবীর (দ:) মাধ্যমে প্রেরিত জীবন ব্যবস্থার, দীনের, আকিদার সরাসরি বিপরীত। কাজেই স্বভাবতঃই অন্তর্মুখী মানুষের সমস্ত ইবাদত নিষ্ফল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রসুলের একটি বাণী স্মরণীয়। তিনি বলেছেন, এমন সময় আসবে যখন মানুষের সারা মাসের রোজা না খেয়ে, অভুক্ত হয়ে থাকা হবে, গভীর রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া ঘুম নষ্ট করা হবে (হাদিস)।

পাশ্চাত্য সভ্যতার একনিষ্ঠ অন্ধ অনুকরণকারী এই নেতৃত্ব চোখ কান বুজে পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিক অর্থাৎ ভারসাম্যহীন, একপেশে উন্নতির দিকে দৌড়াচ্ছেন। একপাশটা হলো অর্থনৈতিক উন্নতি। এই নেতৃত্ব একটা সোজা কথা বুঝতে পারছেন না, সেটা হলো এই যে, পাশ্চাত্যের মত বস্তুতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক সাফল্য লাভ করতে গেলে যে চারিত্রিক গুণগুলি প্রয়োজন তার নিম্নতম মানও তাদের শিক্ষিত সংখ্যালঘু অংশেরও নেই অশিক্ষিত সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের তো নেই-ই। তার প্রমাণ পাশ্চাত্য প্রভুরা চলে যাবার দিনটির চেয়ে আজ প্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলির সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের জীবনের মান নীচু, শুধু তেল সমৃদ্ধ দেশগুলি ছাড়া। অবশ্য ঐ শিক্ষিত সংখ্যালঘু শ্রেণির মান কিছুটা উঠেছে কিন্তু সে ওঠার কারণ সত্যিকার অর্থনৈতিক উন্নতি নয়। সেটার কারণ হলো এই যে, দেশগুলির নেতৃত্ব ও সরকার পাশ্চাত্যের কাছ থেকে যে বিরাট বিরাট অংকের টাকা ঋণ করে এনেছে তার একটা মোটা ভাগ এই শ্রেণির পকেটে গেছে দুর্নীতি, ঘুষ ও চুরির মাধ্যমে। কেরানি সৃষ্টির শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখার ফলে যে শিক্ষিত শ্রেণি সৃষ্টি হয়েছে, হচ্ছে তা একটি স্বাধীন জাতির পক্ষে, বিশেষ করে অনুন্নত দেশের জন্য শিক্ষিত বেকার উৎপাদন ছাড়া কোন কাজে আসবে না। কারণ একটি জাতিকে বা দেশকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নতি করতে গেলেও যে কর্মনিষ্ঠা, যে সাধুতা, যে কর্তব্যপরায়ণতা একান্ত প্রয়োজন তা এদের মধ্যে নেই। ব্যক্তিগত, দলীয় স্বার্থকে এরা দেশের স্বার্থের ওপরে স্থান দেয়। অলসতা, কাজে ফাঁকি এদের মজ্জাগত হয়ে গেছে। বড় বড় ব্যাপার বাদ দিন অতি সাধারণ ও মানবিক দায়িত্ব পালনেও এরা ব্যর্থ। যাদের এরা নকল করেন তাদের দেশে কোন অপরাধ ঘটলে দু'থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুলিশ পৌঁছায় আর এদের দেশে চব্বিশ ঘণ্টায়ও পৌঁছায় না। ও দেশে কোথাও দুর্ঘটনা হলে কয়েক মিনিটের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স এসে আহতকে তীর বেগে হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার, নার্স ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চিকিৎসা শুরু করে। আর এদের দেশে দুর্ঘটনা

ঘটলে অ্যাম্বুলেন্স আসে অনেক চেষ্টা, ডাকাডাকির পর, যদি সেটা অচল হয়ে পড়ে না থেকে থাকে এবং হাসপাতালে পৌঁছার সময় অবধি যদি আহত বেঁচে থাকে তবে দু'এক ঘণ্টা হাসপাতালের বারান্দায় চিকিৎসা ও পরিচর্যাহীন অবস্থায় পড়ে থাকে। ওদেশে সরকারি অফিসে কোন ফাইল আরম্ভ হলে যথাসম্ভব কম সময়ে তার যা সিদ্ধান্ত হবার তা হয়। এদের দেশে যদি ফাইলটি হারিয়ে না যায় তবে রোজ যেয়ে চেষ্টা করতে হয় তাকে এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে নিতে এবং তা করতে কর্মকর্তাদের শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই পকেটের পয়সা খরচ করতে হয় এবং তারপরও কর্মকর্তা পান চিবুতে চিবুতে বলেন, আপনার কাজটা এখন হচ্ছে না, ব্যস্ত আছি, আপনি দু'এক মাস পরে খোঁজ করবেন। ওদের দেশে ট্রেনের আসা যাওয়া দেখে ঘড়ি মেলানো যায় এদের দেশে ট্রেন ইত্যাদির সময়ের অমিল মিনিটের নয় অনেক ঘণ্টার। যাদের নকল করা হচ্ছে আর যারা নকলের চেষ্টায় ওষ্ঠাগত প্রাণ হচ্ছেন তাদের তফাৎ বলতে গেলে শেষ নেই। জীবনের প্রতি স্তরে, প্রতি বিভাগে ঐ একই তফাৎ।

পেছনে দু'একবার পাশ্চাত্য জাতিগুলোর কাছে প্রাচ্যের ঋণের কথা উল্লেখ করে এসেছি। এ সম্বন্ধে আরও দু'চারটি কথা বলা প্রয়োজন। সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, প্রাচ্যের দেশ ও জাতিগুলির তুলনায় পাশ্চাত্যের দেশ ও জাতিগুলি অনেক অনেক ধনী। কারণ অনেক আছে, তবে এখন যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি সে পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান প্রধান কারণগুলি হলো:

ক) পাশ্চাত্যের ছোট বড় প্রায় প্রত্যেকটি দেশ প্রাচ্যের কোন না কোন দেশ, এলাকা সামরিক শক্তি বলে দখল করে তাকে কয়েক শতাব্দী ধরে শোষণ করে বিরাট ধনী ও শক্তিশালী হয়েছে।

খ) খ্রিস্ট ধর্ম, জাতীয় জীবনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবার কারণে ওটাকে ব্যক্তি জীবনে নির্বাসন দেওয়ার ফলে পাশ্চাত্যের মানুষের মন ও আত্মা ক্রমশঃ বস্তুতান্ত্রিক ভাবধারায় পূর্ণ হয়ে গেছে। ধর্ম নিরপেক্ষতার জন্মের ফলে এটা অবশ্যম্ভাবী ছিল, যেমন আজ প্রাচ্যের মানুষেরও দৃষ্টিভঙ্গি (আকিদা) ঐ দিকেই মোড় নিয়েছে তাদের জীবন দর্শন নকল করার কারণে। পাশ্চাত্যের মানুষের বস্তুতান্ত্রিক হয়ে যাবার ফলে তাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এই পার্থিব জীবনটাকে পূর্ণভাবে ভোগ করা। তা করতে গেলে অবশ্যই পরিশ্রম করে সম্পদ আহরণ করতে হবে, কাজেই তারা ক্রমশঃ অতি পরিশ্রমী হয়ে উঠতে লাগলো, মানুষের মধ্যে উপার্জনের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলো। এই একনিষ্ঠ পরিশ্রমের সঙ্গে যোগ হলো তাদের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। এই সম্মিলনের ফল আজ যা দেখছেন পাশ্চাত্য জগতে। পার্থিব উন্নতিতে জগতের শীর্ষে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মানব জীবনের অন্য পার্শ্ব, আত্মার পার্শ্ব তাদের জীবনে অনুপস্থিত। তাই সারাটা জীবন তারা ভোর থেকে রাত পর্যন্ত অবিশ্রান্ত খেটে যায় উপার্জন আর উপার্জন, আরও উপার্জন করে জীবন উপভোগের জন্য। স্বভাবতঃই এর ফল অর্থনৈতিক উন্নতি। আর কারণ আছে, কিন্তু প্রধান কারণ ঐ দু'টি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইউরোপের বিভিন্ন জাতিগুলি যখন প্রাচ্যের দেশগুলি ছেড়ে চলে গেলো তখন নেতৃত্ব ও ক্ষমতা ছেড়ে গেলো তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় 'শিক্ষিত' একটি শ্রেণির কাছে একথা পেছনে বলে এসেছি। এ কথাও বলে এসেছি যে, এই শ্রেণিটির মন মগজ তারা কিনে নিয়েছিল। এদের নিজস্ব সত্ত্বা বলতে কিছুই নেই। পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, প্রশাসনিক, শিক্ষা ইত্যাদি সর্বপ্রকার ব্যবস্থাই হচ্ছে একমাত্র সঠিক ব্যবস্থা, পৃথিবীতে আর কিছুর কোন অস্তিত্ব নেই। স্রষ্টা, আল্লাহ ঐ সব ব্যাপারে যে ব্যবস্থা বিশ্বনবীর (দ:) মাধ্যমে পাঠিয়েছেন তা তাদের কাছে চৌদ্দশ' বছর আগের এক অশিক্ষিত নিরক্ষর বেদুঈন জাতির জন্য প্রযোজ্য হলেও বর্তমান আধুনিক যুগে অচল, তাই পরিত্যাজ্য। একথা তাদের বিগত প্রভুরাই শিখিয়েছেন, তারা শিখেছেন, তাই বিশ্বাস করেন। আশ্চর্য

কি এদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু চৌদ্দশ' বছর আগে ঐ বেদুঈনদের জন্য প্রযোজ্য নামাজ, রোজা, হজ্ব¡, যাকাত পালন করেন। এর পেছনে যুক্তি কি? যাই হোক, পাশ্চাত্য প্রভুরা চলে গেলো কিন্তু এই স্বস্তি ও নিরাপত্তাবোধ নিয়ে গেলো যে, তাদের পরোক্ষ শাসন ঠিকই থাকবে, কারণ যাদের হাতে ক্ষমতা এলো তারা শুধু চামড়ার রংটুকু ছাড়া সর্বোতভাবে পাশ্চাত্যের প্রধিনিধি। এই বাদামী ইংরেজ, কালো ফরাসি আর হলদে ওলন্দাজ স্পেনীয়রা যখন তাদের অশিক্ষিত নিরক্ষর জাতিগুলিকে শাসন করতে আরম্ভ করলো তখন বিগত প্রভুরা বোঝালো যে, তোমরা অতি গরীব (গরীব কিন্তু তারাই করেছে, তারা অধিকার করার আগে প্রাচ্যের এই দেশগুলি ঐসব ইউরোপীয় দেশগুলির চেয়ে বহু ধনী ছিল, এটা ইতিহাস) এখন তোমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি করতে হবে। কারণ মানব জীবনের মুখ্য, মুখ্য কেন, একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে সম্পদ অর্জন করে জীবনের উপভোগ। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নতি করতে গেলে আমাদের মত কল-কারখানা বসাতে হবে। তোমাদের দেশগুলিকে শিল্পায়ন করতে হবে। শিল্পায়ন করতে গেলে টাকার দরকার হবে। তোমাদের তো টাকা নেই (টাকা তো আমরা এই কয়েক শতাব্দী ধরে শুষে নিয়েছি)। কোন চিন্তা নেই, আমরা অত্যন্ত মহানুভব, টাকা আমরা ধার দেবো, তোমরা কল-কারখানা লাগানো শুরু করে দাও। পাশ্চাত্যের বিগত প্রভুদের এই মহানুভবতার আসল উদ্দেশ্য ছিল অন্য। উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক অধিকার ছেড়ে আসতে বাধ্য হলেও অর্থনৈতিক আধিপত্য অক্ষত্নু রাখা। সুদখোর মহাজন যেমন মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ধার কর্জ দিয়ে খাতককে ঋণে জর্জরিত করে একদিন তার সর্বস্ব নিয়ে নেয় ঠিক সেই উদ্দেশ্য। মানসিকভাবে পাশ্চাত্যের দাস, প্রাচ্যের নেতৃত্ব পাশ্চাত্যের ঐ প্রস্তাব যে প্রত্যাখ্যান করবে না সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না। তারা ঐ প্রস্তাব লুফে নিয়েছিল তা ইতিহাস। শুধু লুফে নেন নি, ইহুদি প্রবর্তিত সুদভিত্তিক ব্যবস্থায় রাজী হয়ে ঐ ঋণ গ্রহণ করেছেন প্রাচ্যের মুসলিম নেতৃত্ব, যারা নামাজও পড়েন, রোজাও রাখেন, হজ্বও করেন কেউ কেউ পীরের মুরীদ এমনকি অনেকের কপালে সাজদার দাগও হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের আসল ইলাহ পাশ্চাত্যের প্রভুদের উপদেশ ও প্রস্তাব কি তারা ফেলে দিতে পারেন? আল্লাহ যে সুদ, সুদভিক্তিক সমস্ত অর্থনৈতিক আদান-প্রদান কঠোরভাবে নিষিদ্ধ অর্থাৎ হারাম করে দিয়েছেন তা ঐ সব 'মুসলিম' নেতাদের কাছে কোন অর্থই বহন করে না।

যদিও পাশ্চাত্যের ঋণদাতা ধনী দেশগুলির আসল উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্যের জাতিগুলির গলায় ঋণের সোনার শেকল পড়িয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং অর্থনৈতিক দাস বানিয়ে রাখা, কিন্তু প্রাচ্যের জাতিগুলি যদি ঐ ঋণের পূর্ণ সদ্ব্যŸহার করে তা ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারতো তবে অর্থনৈতিক উন্নতি ও তাদের উদ্দেশ্য- জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে পারতো। কিন্তু সেটাও করা সম্ভব হয় নি। কারণ কিছু পেছনে বলে এসেছি। এখানে আবার বলছি। প্রথম কারণ শিক্ষার অভাব। অন্ধ অনুকরণকারী নেতৃত্ব, স্বাধীনতা পাবার পর কেরানি সৃষ্টিকারী শিক্ষাব্যবস্থা বদলিয়ে চরিত্র সৃষ্টিকারী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন নি। কাজেই সে চরিত্র জাতির মধ্যে সৃষ্টি হয়নি যেটা ছাড়া জাতির যে কোন রকমের উন্নতি তো পরের কথা, জাতি টিকেই থাকতে পারে না। কেরানি সৃষ্টির শিক্ষা ব্যবস্থা না বদলানোর ফল এই হয়েছে যে, পাশ্চাত্য প্রভুরা চলে যাবার সময়ে প্রাচ্যের দেশগুলিতে, বিদ্যালয়গুলিতে যে শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, শিক্ষকের প্রতি সম্মান ইত্যাদি ছিল আজ তার একশ' ভাগের এক ভাগও নেই। এগুলি যার যার দেশের রাজনৈতিক দলগুলির লেজুড়বৃত্তি করে বিদ্যালয়গুলিতে দলাদলি, গোলাগুলি, ছুরি মারামারিতে ব্যস্ত। ওটাতো গেলো চরিত্রের কথা, কেরানিকূল সৃষ্টি করে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য যে ভাষা, অংক, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হতো আজ তার মানও গোলামী যুগের চেয়ে অনেক নীচে নেমে গেছে, একথা দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের কাছে সত্য। ব্রিটিশ শাসনামলে মেট্রিকুলেশন পাশ করা একজন মানুষ যতটুকু

ইংরেজি, বিজ্ঞান, গণিত, ভুগোলে দক্ষতা অর্জন করতো, আজ মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়েও মানুষ সে দক্ষতার ধারে কাছেও যেতে পারেন না, তাদের অধিকাংশই শুদ্ধ করে বাংলা বা ইংরেজিতে একটি পৃষ্ঠা লিখতে পারেন না, ইংরেজিতে দোভাষীর কাজ করা তো দূরের কথা।

দ্বিতীয় কারণ পাশ্চাত্যের অনুকরণ করে তাদের সব কিছুই গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা। ঐ ব্যবস্থা মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত এবং ইউরোপের সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, মানসিক ও চারিত্রিক পরিবেশে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে অর্থাৎ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমানের রূপ পেয়েছে। ঐ ব্যবস্থা প্রাচ্যের নেতৃত্ব তাদের অন্ধ হীনমন্যতায় অপরিবর্তিত রূপে ইংরেজিতে যাকে বলে Lock stock and barrel, তাদের নিজ নিজ দেশ ও জাতিগুলির উপর চাপালেন। এদের মানসিক দাসত্ব এতো গভীর যে, অশিক্ষিত নিরক্ষর মানুষেরও যে সাধারণ জ্ঞান আক্কেল থাকে সেটুকু ব্যবহার করলেও তারা দেখতে পেতেন যে, সম্পূর্ণ ভিন্ন, প্রধানত বিপরীত পরিবেশে যে ব্যবস্থা (System) ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য জগতে গড়ে উঠেছে তা হঠাৎ করে প্রাচ্যের জাতিগুলির উপর চাপালে তা চলবে না, অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হবে বিশৃঙ্খলা, হতাশা। ঠিক তাই হয়েছে। স্বাধীনতা পাবার পর প্রাচ্যের অধিকাংশ দেশগুলির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে ও সেই সব দেশের সামরিক বাহিনীকে শাসনভার হাতে নিয়ে কঠোরতার সাথে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হয়েছে। একদিকে চরিত্রহীনতার জন্য কাজে ফাঁকি, কর্মবিমুখতা, ব্যক্তি ও দলগত স্বার্থকে জাতির স্বার্থের ওপরে স্থান দেওয়া ইত্যাদি, অন্যদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা, ঘন ঘন সরকার বদল, আন্দোলন, কথায় কথায় ধর্মঘট ইত্যাদি এই দুই মিলে কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, কোন বড় শিল্পায়নকে সুষ্ঠুভাবে কাজে পরিণত করতে দেয় নি। কাজেই বিগত প্রভুদের কাছ থেকে বিরাট অংকের ঋণ এনে প্রাচ্যের নেতৃত্ব তাদের কাঙ্ক্ষিত জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে পারে নি, মান আরও নেমে গেছে। মাঝখান থেকে এই দেশগুলির উপর সুদে আসলে যে অংকের ঋণ দাঁড়িয়েছে তা দেখলে মাথা ঘুরে যায়। স্বাধীনতা-পরবর্তী অর্থবছরগুলোতে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন কর্মকাণ্ড পুরোপুরি বৈদেশিক ঋণনির্ভর হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৪২ শতাংশই বৈদেশিক ঋণের অর্থ। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, পাবলিক ও প্রাইভেট মিলিয়ে ২০২৩ সালের শেষ প্রান্তিকে বাংলাদেশের ঋণ ১০০.৬৩ বিলিয়ন ডলার বা ১ লাখ ৬ হাজার ৩০০ কোটি ডলার। টাকার অঙ্কে যার পরিমাণ ১১ লক্ষ ৭৯ হাজার ১৫১ কোটি ৪৭ লাখ টাকারও বেশি। চলতি বছরের সিপিডির প্রতিবেদন অনুযায়ী, এখন মাথাপিছু ঋণ দেড় লাখ টাকার মতো (সূত্র: প্রথম আলো-২৪ মে ২০২৪)। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ৩০০ কোটি ডলারের বেশি বিদেশি ঋণ শোধ করেছে বাংলাদেশ (সূত্র: প্রথম আলো ২৯ জুন ২০২৪)।

এই যে ঋণের টাকা, তার অধিকাংশই চলে যাচ্ছে দুর্নীতিবাজদের পকেটে। ফলে উন্নয়ন হচ্ছেও না। উন্নয়নের ব্যর্থতার জন্য আসল শোধ করা দূরের কথা শুধু সুদটুকুই এই সব দেশ দিতে পারছে না। কেবল কাজেই ঋণের অংক লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলছে। বিগত পাশ্চাত্য প্রভুরা যা চেয়েছিল তা পূর্ণমাত্রায় অর্জন করেছে। প্রাচ্যের জাতিগুলির গলায় ঋণের শেকল লাগিয়ে তারা শুধু অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নয়, অন্যান্য বহুদিক দিয়ে কর্তৃত্ব করে চোলেছে। তারচেয়েও বড় কথা হচ্ছে, ঐ অসম্ভব বিরাট অংকের ঋণের বোঝা ঐ নেতাদের ঘাড়ে নয়, ঐ বোঝা আসলে তাদের দেশগুলির জনসাধারণের ঘাড়ে। ঋণের শুধু সুদের একটা অংশ আদায় করার জন্য এই নেতৃত্ব করের উপর কর, খাজনার উপর খাজনা আরোপ করে চলেছেন, তা সত্ত্বেও ঋণের বোঝা বেড়ে চলছে। এই সব দেশের প্রতিটি মানুষের ঘাড়ে হাজার হাজার টাকার ঋণের বোঝা কিন্তু তারা জানে না। ঐ যে গরীব কৃষক ক্ষেতে হাল দিচ্ছে, সে জানে না যে, যাদের তারা ইউরোপের নকল করা প্রথায় ভোট দিয়ে নেতা নির্বাচিত করেছে তারা

তার প্রতিনিধি হয়ে পাশ্চাত্যের কাছ থেকে হাজার হাজার কোটি ডলার, পাউন্ড ঋণ নিয়েছে। ঐ যে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির অফিস কর্মচারীরা সকাল-সন্ধ্যা অফিস যাচ্ছেন আসছেন, ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করছেন, সবাই বেখবর যে, তাদের প্রত্যেকের মাথার উপর বিরাট অংকের ঋণ চেপে আছে এবং তা দিতে হবে, আজ হোক আর কাল হোক। আজ একথা পাশ্চাত্যের মহাজন জাতিগুলি ও প্রাচ্যের খাতক জাতিগুলি উভয়ের কাছেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে, এইসব অর্ধাহারী, অনাহারী প্রায় উলঙ্গ জাতিগুলির আর সাধ্য নেই ঐ বিরাট ঋণ শোধ করার। এতে অবশ্য মহাজন জাতিগুলির ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, তাদের কোন লোকসান হবে না। কারণ ঋণ দেবার সময়ই তারা যেসব শর্ত আরোপ করেছিল এবং গদগদ চিত্তে প্রাচ্যের নেতৃত্ব যে সব শর্ত মেনে নিয়েছিল তার বদৌলতে ইতোমধ্যেই তারা সুদে আসলে ঋণের টাকা উঠিয়ে নিয়েছে। আজ আসল টাকা না পেলেও তাদের কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু কাগজেপত্রে বিরাট টাকা তাদের পাওনা হয়ে আছে, যার ফলে প্রাচ্যের নেতৃত্ব করজোড়ে মহাজনদের সামনে দাঁড়িয়ে দয়া প্রার্থনা করছেন, আরও ঋণ চাইছেন। আরও ঋণ চাইছেন এই জন্য যে, আরও ঋণ না হলে তাদের চলবে না। নতুন নতুন ঋণ নিয়ে ঐ ঋণের টাকা দিয়েই কিছু কিছু সুদ এরা শোধ করছেন। আজ পাশ্চাত্যের কাছে প্রাচ্যের প্রায় সব কটি দেশের, বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলির শুধু হাড্ডি-মজ্জা নয়, আত্মা পর্যন্ত দেনাবদ্ধ হয়ে গেছে।

এখন পাশ্চাত্যের জুডিও খ্রিস্টান সভ্যতার পদতলে লুণ্ঠিত এই মুসলিম নেতৃত্বের অন্য দিকটা দেখা যাক। পেছনে আল্লাহর নবীর (দ:) একটা হাদিস উল্লেখ করে এসেছি, যেটায় তিনি বলেছেন যে, তার উম্মাহর মধ্যে সর্বদাই একটা দল থাকবে যেটা মানুষকে আল্লাহর পথে আনার চেষ্টা করতে থাকবে, ইসলামের উদ্দেশ্য কী বুঝবে এবং বিপথগামী আকিদা উদ্দেশ্যভ্রষ্ট জাতিকে আবার সত্য পথে আনার জন্য জেহাদ করতে থাকবে। আকিদায় অনেক ভ্রান্তি সত্ত্বেও জাতীয় জীবনে দীনের বিধি বিধান ফিরিয়ে আনতে জনসংখ্যার একটি বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা বা চাপ কমবেশি সর্বদাই এ জাতির ইতিহাসে রয়েছে। এ চাপ সম্বন্ধে বর্তমান মুসলিম দুনিয়ার নেতৃত্ব সজাগ আছে এবং সর্বতোভাবে তার মোকাবেলা করছে। এদের এই মোকাবেলার উপায় আলোচনা করছি।

প্রথম উপায় হলো প্রকৃত ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞানহীন অশিক্ষিত জনসাধারণকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য বাহ্যিক, অপ্রয়োজনীয় কাজ করে দেখানো যে নেতারাও অতি উৎকৃষ্ট মুসলিম। যেমন মসজিদ তৈরি ও মেরামতের জন্য কিছু কিছু টাকা পয়সা বরাদ্দ করা, টাকার নোটে মসজিদ ইত্যাদির ছবি ছাপানো, শুক্রবার ছুটির দিন ঘোষণা করা, বিভিন্ন সরকারি বইয়ের শুরুতে বিসমিল্লাহির রহমানের রহিম লেখা ইত্যাদি। ইংরেজীতে যাকে বলা হয় Window dressing বাইরে রং লাগিয়ে চকমকে করে মানুষকে ধোঁকা দেওয়া। এই ধোঁকা দেওয়ার সর্বাধুনিক প্রক্রিয়া হচ্ছে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম (State religion) ঘোষণা দেওয়া। এতে বুনিয়াদী কোন পরিবর্তন হয় না, মোশরেকী ও কুফরী রাষ্ট্র ব্যবস্থা পুরোপুরি বহাল থাকে, কিন্তু আকিদাচ্যুত অজ্ঞ জনসাধারণ খুব ইসলাম হচ্ছে মনে করে মহাখুশি থাকে, তাদের সরকারগুলিকে অতি ধার্মিক সরকার মনে করে এবং সমর্থন দেয়। একটি বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক নেতা একবার প্রচণ্ড গণবিক্ষোভ মোকাবেলা করতে চেষ্টা করলেন শুক্রবারকে ছুটির দিন ঘোষণা করে এবং পবিত্র কাবার এমাম সাহেবকে দেশে নিয়ে এসে শহরে শহরে জুমার নামাজের এমামতি করিয়ে।

দ্বিতীয় উপায় হলো যার যার দেশের রাজনৈতিক দলগুলির, যেগুলির মূলনীতি পাশ্চাত্য থেকে আমদানি করা, অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মবিরোধী তাদের ঐ জেহাদী দলটির বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া। তাদের মধ্যে সংঘর্ষ লাগিয়ে

দেওয়া। সম্ভব হলে তাদের দিয়েই এদের দমন করা। তাতেও যদি না হয় তবে তারা তৃতীয় উপায় অবলম্বন করেন। সেটা হলো এই প্রকৃত দীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামীদের গ্রেফতার করা, তাদের উপর লাঠি, গুলি চালানো, তাদের ফাঁসিতে ঝোলানো।

বর্তমান মুসলিম দুনিয়ার নেতৃত্ব অজ্ঞ জনসাধারণকে বোকা বানানোর চেষ্টায় জনসভায় বক্তৃতা দেন- ইসলাম শুধু সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মই নয় এটা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা (পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা বা Complete code of life হলে অবশ্যই তাতে রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, আইন, দণ্ডবিধি, প্রশাসন ও শিক্ষা ব্যবস্থা থাকতে হবে-এটা সাধারণ জ্ঞান) এবং একমাত্র ইসলামই দুনিয়াতে শান্তি আনতে পারে। বক্তৃতা শুনে জনতা হাততালি দেয়, নেতাদের নামে জিন্দাবাদ দেয় আর মনে করে তারা উৎকৃষ্ট মুসলিম নেতৃত্বের অধীনে আছে। নেতারা বক্তৃতা সভা শেষে তাদের সচিবালয়ে ফিরে গিয়ে দেশ পরিচালনা করেন তাদের পূর্ব প্রভুদের শেখানো শেরক ও কুফরী ব্যবস্থা অনুযায়ী। নিদারুণ পরিহাস এই যে, একদা দুনিয়ার শিক্ষক এই জাতি ফকীহ মোফাস্সের আর দীনি আলেমের কার্য ফলে অশিক্ষা আর মূর্খতার এমন স্তরে নেমে গেছে যে, নেতাদের ঐ পরিষ্কার মোনাফেকিটুকু বোঝার মত সাধারণ জ্ঞানটুকুও লোপ পেয়েছে।

ইহুদি খ্রিস্টান ‘সভ্যতা’ দাজ্জালের গোলাম হয়ে এই অন্ধ নেতৃত্ব তাদের যার যার দেশের অশিক্ষিত ক্ষুধার্ত জনগণকে কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছেন তা বিচার করে দেখা অবশ্যই অতি গুরুত্বপূর্ণ। তারা অবশ্যই জান্নাতের পানে নিয়ে যাচ্ছেন না, একথা আহম্মকও বলবে না। কারণ তাদের ঘোষিত উদ্দেশ্যই হচ্ছে উন্নত দেশগুলির মত জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। সোজা কথায় উন্নত অর্থাৎ পাশ্চাত্য জাতিগুলির জীবনদর্শন অনুসরণ করা, যে দর্শন হচ্ছে উদয়াস্ত কঠিন পরিশ্রম করে প্রচুর সম্পদ আহরণ কর ও প্রাণ ভরে জীবন ভোগ কর। এটা যে তারা কখনো পারবেন না তা কারণসহ পেছনে বলে এসেছি। ঐ চেষ্টা করতে যেয়ে বিরাট অংকের টাকা ধার করে আজ এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছেন যে, তারা যদি উন্নয়নের কোন প্রচেষ্টা না করতেন, কোন টাকা ধার না করতেন তবে এই দেশগুলির অর্থনৈতিক অবস্থা বর্তমানের চেয়ে ভালো থাকতো। অন্ততঃ এখনকার মত প্রতিটি মানুষের মাথার উপর হাজার হাজার টাকার ঋণের বোঝা থাকতো না। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেই যে, বর্তমান ‘মুসলিম’ দুনিয়ার নেতৃত্ব সফলকাম হলেন অর্থাৎ তাদের দেশগুলিতে পশ্চিমের উন্নত দেশগুলির মত ধনী বানিয়ে দিলেন, তাহলে কী হবে? ঐ দেশগুলি উন্নত শুধু একটি দিক দিয়ে- বস্তুতান্ত্রিক দিক দিয়ে, ঘর-বাড়ি, গাড়ি, প্লেন, টিভি, ওয়াশিং মেশিন, আরাম আয়েশের দিক দিয়ে, জীবন উপভোগের দিক দিয়ে। মানবজীবনের অপর দিকের প্রতি তারা অন্ধ। আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা ত্যাগ করে তারা নিজেরা জীবন বিধান তৈরি করে নিয়েছে। সেই একপেশে ভারসাম্যহীন জীবন বিধান, দীনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে বস্তুতান্ত্রিক ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানে উন্নতির ফল হিসাবে তারা আজ এমন ভয়াবহ অস্ত্র তৈরি করেছে যা দিয়ে সমস্ত মানবজাতিকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলা যায়। পারিবারিক ও ব্যক্তিগত নৈতিক অবস্থা আরও মর্মান্তিক। জাতীয় জীবন থেকে ধর্মকে নির্বাসন দেবার পর থেকে যে পতন আরম্ভ হয়েছে তা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, আজ পাশ্চাত্যে পারিবারিক বন্ধন প্রায় অনুপস্থিত, যৌন নৈতিকতা ধরতে গেলে কিছুই নেই। সমকামিতা সেখানে সাংবিধানিকভাবে বৈধ নয় কেবল, ছাত্রসমাজে, সেনাবাহিনীতে এবং সাধারণ্যে তুমুল জনপ্রিয়। চৌদ্দ পনের বছরের অবিবাহিতা মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৮০ থেকে ৯০ জনের সতীত্ব নেই। প্রতি তিনটি সদ্য প্রসূত শিশুর মধ্যে একটা জারজ। এসব হিসাব তাদেরই করা, আমাদের নয়। খুন, জখম, ছিনতাই ইত্যাদি অপরাধের হার এখনও গরীব দেশগুলির তুলনায় অনেক বেশি। প্রাচ্যের বিশেষ করে ‘মুসলিম’ দেশগুলির বর্তমান নেতৃত্ব উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছেন যার যার দেশের

অশিক্ষিত সরল অজ্ঞ জনসাধারণকে নিয়ে ঐ আত্মাহীন নারকীয় সভ্যতার দিকে। আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো শান্তি, তাই এর নাম ইসলাম (শান্তি)। শুধু অর্থনৈতিক উন্নতিতে শান্তি আসবে না। তা আসলে আজ সবচেয়ে ধনী ইউরোপ, আমেরিকা, জাপানে মহাশান্তি বিরাজ করত। তা করছে না। অর্থ দিয়ে আরাম আয়েশের বন্দোবস্ত করা যায় কিন্তু শান্তি পাওয়া যায় না। আরাম আয়েশ (Comfort) আর শান্তি (Peace) এক নয়। শান্তির প্রথম শর্তই হলো জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা। প্রকৃত ইসলাম মানুষকে যে শান্তি দিয়েছিল, মানুষ দরজা খুলে ঘুমাতে পারতো, সোনার দোকান খোলা রেখে মানুষ মসজিদে যেত, কেউ একটি পয়সাও সরাতো না। রাস্তায় কারও কোন মূল্যবান বস্তু হারিয়ে গেলে সেটা যথাস্থানে খুঁজে পাওয়া যেত, কেউ সেটা নিজের মনে করে নিয়ে যেত না। এটা হচ্ছে শান্তির উদাহরণ। এমন একটি পরিবেশে গাছের নিচে ঘুমালেও মানুষের মনে প্রশান্তি বিরাজ করে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহর রসুল এবং ইসলামের প্রথম চারজন খলিফার কারও কোন দেহরক্ষী ছিল না। তারা প্রায়ই গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিয়েছেন বা ঘুমিয়েছেন এমন বর্ণনাও ইতিহাসে দেখি। পক্ষান্তরে পশ্চিমা সভ্যতা আমাদেরকে এমন একটি সমাজ উপহার দিয়েছে যেখানে প্রতিটি মানুষ একে অপরকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। অন্ধ ভিখারির থালা থেকেও পয়সা চুরি হয়, মসজিদ থেকেও জুতা চুরি হয়, শাসকরা বহু স্তরবিশিষ্ট নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে অবস্থান করেন, উচ্চতর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত দেহরক্ষী বাহিনী নিয়ে তারা চলাফেরা করেন, গাড়িতে ব্যবহার করেন বুলেটপ্রুফ কালো কাচ। এক মুহূর্তের জন্যও তারা নিজেদেরকে নিরাপদ ভাবতে পারেন না। সম্পদশালী মানুষের জীবন তো একটি যন্ত্রণারই নামান্তর। তারা এয়ার কন্ডিশন্ড বাড়ি-গাড়ি ব্যবহার করেন কিন্তু তাদের অধিকাংশেরই পারিবারিক জীবন নরকতুল্য। সম্পদের হিসাব মেলাতে মেলাতে তারা পেরেশান, আরও সম্পদশালী হওয়ার প্রতিযোগিতায় তারা যেন একেকটি মত্তহস্তী। সুতরাং আর্থিক উন্নয়ন মানুষকে আরাম, আয়েশ ও জীবনোপভোগের নিশ্চয়তা দিতে পারলেও শান্তি দিতে পারে না। আর তাদের জাতীয় জীবনের অবস্থা প্রমথনাথ বিশির ভাষায়, ‘‘ইউরোপ অর্জন করিয়াছে বটে, কিন্তু স্বস্তিতে ভোগ করিতে পারিতেছে কি? তাহার অঙ্গের রণ-ক্ষত যে শুকাইতেই সময় পাইতেছে না- ভোগ করিবে কি?’’ সুতরাং আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি শান্তির নিশ্চয়তা দিতে পারে কেবলমাত্র স্রষ্টার দেওয়া জীবনব্যবস্থা।

ইউরোপ আমেরিকার কথা না হয় বাদ দিলাম, এই মুসলিম দুনিয়ায়ই একটা অংশ তো তেলের বদৌলতে পাশ্চাত্যের মত ধনী হয়ে গেছে। তারা তো টাকা রাখবার জায়গা না পেয়ে তাদের মহামূল্যবান গাড়িগুলিকে পর্যন্ত সোনার পাত দিয়ে মুড়ে রেখেছে। তাতে আল্লাহর কী হয়েছে? রসুলাল্লাহর (দ:) বা কী হয়েছে? যে জন্য মুসলিম জাতিরই সৃৃষ্টি হয়েছে সেই উদ্দেশ্য অর্জন করাতো দূরের কথা, ঐ বিপুল সম্পদ দিয়ে, এলাকায় ও জনসংখ্যায় চল্লিশ গুণ বেশি হয়েও ছোট্ট ইসরাইলের লাথি খেতে খেতে তাদের পেটের হালুয়া বের হচ্ছে। তাহলে বাকি মুসলিম দুনিয়ার নেতৃত্ব কোন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পেছনে পড়ি কি মরি হয়ে ছুটছেন?

পাশ্চাত্যের ঋণ দেবার প্রস্তাবে এই নেতৃত্ব গদ গদ চিত্তে যে সোনার শেকল নিজেদের গলায় নিলেন এবং যার যার দেশের জনগণের গলায় পড়ালেন সে শেকল শুধু যে সুদের পর্বত তৈরি করে অর্থনৈতিক দাসত্ব চাপিয়ে দিয়েছে তাই নয়, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ঐ শেকল কম প্রভাব বিস্তার করে নি। ঋণাবদ্ধ খাতকের জীবনে মহাজনের প্রভাব কতখানি তা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যে সম্পূর্ণভাবে বুঝবে না। মহাজনকে খুশি রাখতে খাতককে কতদূর যেতে হয় তা যে কোন একজন খাতককে জিজ্ঞাসা করুন। ঋণগ্রস্থ এমন খাতককে বৃদ্ধ মহাজনের মন রক্ষার জন্য কিশোরী মেয়েকে তার কাছে বিয়ে দিতে হয়েছে এমন খবর অনেকেই খবরের কাগজে পড়েছেন। ঋণ রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও তাই। খাতক রাষ্ট্রগুলিকেও ইচ্ছায় অনিচ্ছায় মহাজন রাষ্ট্রগুলির বহুবিধ ইচ্ছাকে পূরণ করতে

হয় তাদের খুশি রাখার জন্য। ঐসব বহুবিধ ইচ্ছার মধ্যে একটা অতি প্রয়োজনীয় হচ্ছে এইসব গরীব খাতক দেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচার। এটা এজন্য নয় যে, তারা অতি উৎকৃষ্ট খ্রিস্টান। উৎকৃষ্ট খ্রিস্টান তারা মোটেই নয়, উদ্দেশ্য হলো রাজনৈতিক। ইতোপূর্বে যখন তারা সামরিক শক্তিতে প্রাচ্য অধিকার করে নিয়েছিল তখন তাদের সামরিক বাহিনীগুলির পেছনে পেছনে এসেছিল পাদরীর দল। পাশ্চাত্যের ঐ দখলকারী রাষ্ট্রগুলি ঐ পাদরীদের সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে খ্রিস্টধর্ম প্রচার কাজে। তাদের প্রচার কাজে সরকারি ভাবে সাহায্য করেছে, তাদের জন্য স্কুল দিয়েছে, ঐসব স্কুলে ভর্তি হতে বাধ্য করার জন্য দেশি বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ইত্যাদি বন্ধ করে দিয়েছে। তারপর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আর্থিক সাহায্য তো আছেই। উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সব দেশের মানুষকে খ্রিস্টান বানিয়ে ফেলতে পারলে তাদের প্রভুত্ব চিরস্থায়ী হয়ে যাবে। আর সবাইকে না পারলেও একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে ধর্মান্তরিত করতে পারলে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিকভাবে ঐ অংশ তাদের পক্ষে থাকবে। দুই শতাব্দী পর্যন্ত তারা যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়েছে, পরবর্তীতে এই অধিকৃত দেশগুলিতে স্বাধীনতা দিয়ে চলে গেলেও সে সব দেশে তাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ অক্ষত্থু রাখা রাজনৈতিকভাবে প্রয়োজন। এইখানে ঐ ঋণের সোনার শেকল অত্যন্ত কাজে এসেছে। ঔপনিবেশিক সময়ের চেয়ে আজ প্রাচ্যের এইসব দেশে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারকারীদের সংগঠন তাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে শিক্ষালয়, নতুন নতুন চার্চ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সব দিকে দিয়ে তাদের কর্মতৎপরতা গোলামী যুগের চেয়ে অনেক বেশি, অনেক সাফল্যমণ্ডিত। জনকল্যাণের নামে, ঝড় বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সাহায্যের নামে তারা তাদের আসল কাজ করে যাচ্ছে, তাদের পেছনে তাদের রাষ্ট্রের আর্থিক সাহায্য তো আছেই আরও আছে কূটনৈতিক সাহায্য। প্রাচ্যের এই মন মগজ বিক্রি করা নেতৃত্ব তাদের পূর্ব প্রভুদের পক্ষ হয়ে তাদের যার যার দেশের মানুষদের খ্রিস্টান করার কাজে সাহায্য করছেন। ফলও হয়েছে। ইউরোপ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি যেদিন প্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলি ছেড়ে যায় সেদিন এই দেশগুলিতে খ্রিস্টানদের যে সংখ্যা ছিল আজ তা থেকে অনেক বেশি।

অমোসলেম খ্রিস্টান ইউরোপিয়ান শাসকরা যখন শাসন করত, অর্থাৎ এই তথাকথিত মুসলিম জাতিগুলি যখন তাদের দাস ছিল তখন তারা যতটুকু ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করত অর্থাৎ শুধু ব্যক্তিগত দিকটা, এখন স্বাধীন হবার পরও ততটুকুই করে, তার চেয়ে একটুকুও বেশি নয়। খ্রিস্টানদের অধীনে দাস অবস্থায় যতটুকু 'ধর্মকর্ম' করার অধিকার ছিল আজও তাই আছে, বেশি নয়। বিদেশি প্রভুরা দয়া করে তাদের ঘৃণিত দাসদের নামাজ, রোজা, হজ্ব¡, যাকাত ইত্যাদি ব্যক্তিগত সবরকম 'ধর্মকর্ম'ই করতে দিতো, দেশি প্রভুরাও দেয়। সাদা বিদেশি প্রভুরা তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইনব্যবস্থা, বিচার, দণ্ডবিধি ইত্যাদি ব্যাপারে ধর্মকে আনতে দিতো না, কালো, বাদামী প্রভুরাও দেয় না। তখনকার দাসত্ব আর এখনকার স্বাধীনতা এর মধ্যে ইসলামের ব্যাপারে কোন তফাৎ নেই। দাসত্বের সময়ের আর এখনের মধ্যে তফাৎ শুধু এইটুকু যে, ঐ সময় তাদের শাসনের গুণে যে জানমালের, সম্মানের যে নিরাপত্তা ছিল আজ তার শতকরা দশভাগও নেই।

শিক্ষিতদের দুর্নীতিতে ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থার দায়

আমাদের দেশে সাধারণ মানুষকে দুর্নীতির ব্যাপারে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই। সরকারি এমন কোনো সেবাখাত নেই যেখানে অনিয়ম-ঘুষ ছাড়াই নির্বিঘ্নে সেবা নিতে পারছে সাধারণ মানুষ। ইউনিয়নের ভূমি অফিস থেকে শুরু করে পাসপোর্ট অধিদপ্তর সরকারি হাসপাতালসহ প্রত্যেক সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে দুর্নীতির ছড়াছড়ি। জনগণের ভ্যাট-ট্যাক্সের অর্থায়নে চলা এই প্রতিষ্ঠানগুলো যেখানে বিনামূল্যে পরিষেবা দিতে

বাধ্য, সেখানে অতিরিক্ত অর্থ ছাড়া সেবা পাচ্ছে না সাধারণ মানুষ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই অতিরিক্ত টাকা না দেয়ার কারণে উল্টো সেবাগ্রহীতারা হেনস্তার শিকার হচ্ছেন। দুর্নীতির কালো টাকায় ফুলে-ফেঁপে উঠেছে দুর্নীতিবাজরা। আর পরিতাপের বিষয় হলো: এই দুর্নীতির সাথে জড়িত যারা, তারা আর কেউ নয়, প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত ও উচ্চ-শিক্ষিত শ্রেণিটি। দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে বসে কলমের খোঁচায় অন্যায়ভাবে সাধারণ মানুষের সেবা পাওয়ার অধিকার ক্ষুণ্ন করছে, অনেক ক্ষেত্রে জালিয়াতির মাধ্যমে ফাঁদে ফেলে অর্থ-সম্পদও হাতিয়ে নিচ্ছে, আবার ঘুষের বিনিময়ে কাউকে দেখিয়ে দিচ্ছে অনিয়মের পথ। প্রায়শ পত্রিকার খবরে দেখা যায়, এসব দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তার মাসিক বেতনের চাইতেও কয়েকগুণ বেশি তাদের জীবনযাত্রার ব্যয়। দশ-বিশ হাজার টাকার বেতনের কর্মচারী এরই মধ্যে গড়ে তুলেছে আলিশান বহুতল ভবন। ঘুষ-অনিয়মের মাধ্যমে অবৈধ অর্থ উপার্জনে এখন আর রাখঢাক নেই। ‘বাড়তি উপার্জন কিংবা ‘স্পিডমানি’-র নামে একরকম বৈধতার স্বীকৃতিও দিয়েছে এই দুর্নীতিবাজ শ্রেণিটি। সরকারি চাকরি সোনার হরিণ, লাখ লাখ টাকা দিয়ে সেই চাকরি পেতে হয়, আর চাকরি পেয়ে দুর্নীতি করে কোটি কোটি টাকা উসুলও করতে হয়- এটাই অলিখিত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের সমাজে। বাংলাদেশের এই পরিস্থিতি আন্তর্জাতিকভাবেও সমালোচিত হচ্ছে।

বার্লিনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর ২০২৩ সালের জন্য দুর্নীতির ধারণাসূচক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, দুর্নীতির মাত্রা বিশ্বের যেসব দেশে সবচেয়ে বেশি, তার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দশম। আর দুর্নীতি বিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থা টিআইবি-এর ২০২২ সালের রিপোর্ট অনুসারে দেশের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত শীর্ষ তিন খাতে রয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, পাসপোর্ট অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এর তথ্যানুসারে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থায় ৭৪ শতাংশের বেশি সংখ্যক পরিবার দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অনুরূপভাবে, পাসপোর্ট অধিদপ্তরে ৭০.৫ শতাংশ, বিআরটিএ কার্যালয়ে ৬৮.৩ শতাংশ, বিচারিক সেবাখাতে ৫৬.৮ শতাংশ, সরকারি স্বাস্থ্য সেবায় ৪৮.৭ শতাংশ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে ৪৬.৬ শতাংশ এবং ভূমি সেবায় ৪৬.৩ শতাংশ পরিবার দুর্নীতির শিকার হয়েছে বলে গবেষণায় উঠে এসেছে। ইতোমধ্যে দেশের গণমাধ্যমগুলোর শিরোনামে জায়গা করে নিয়েছে সরকারি প্রতিরক্ষা-প্রশাসন-রাজস্বখাতগুলোর গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোর ভয়ংকর দুর্নীতির খবর। কয়েকটি সাম্প্রতিক দুর্নীতির উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

ঘটনা ১

মানবজমিনের অনুসন্ধানে, সাবেক সেনাপ্রধান আজিজ আহমেদ ও তার পরিবারের সদস্যদের বিপুল পরিমাণ অবৈধ সম্পত্তির খোঁজ মিলেছে। রাজধানীর তুরাগ নদী ঘেঁষা আমিনবাজার সিলিকন সিটি হাউজিংয়ে বাংলো বাড়িসহ ৮০ কাঠা, ছোটভাই তোফায়েল আহমেদ জোসেফের নামে প্রায় ২০০ কাঠা, আশুলিয়ার মনোসন্তোষপুরে আজিজ আহমেদের নামে প্রায় ৫০ বিঘার উপরে, মোহাম্মদপুর রামচন্দ্রপুরে আনুমানিক ৬ কোটি টাকা মূল্যমানের ৪ কাঠার দুটি প্লট, শ্যামলাপুরে ৯৮ শতাংশ জমি, শ্যামলাসি স্কুলের পাশে ৫ কাঠা জমিতে একতলা বাড়ি, মিরপুর ১২ নম্বরে ৫ কাঠার প্লটে ১০ তলা বাড়ি, বাউনিয়াতে ২১টি ফ্ল্যাটের বাড়ি রয়েছে এই সাবেক সেনাপ্রধানের। (সূত্র: মানবজমিন, ০৫ জুন ২০২৪)। দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে গত ২১ মে জেনারেল (অব.) আজিজ ও তার পরিবারের সদস্যদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

ঘটনা ২

পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদ এবং তাঁর স্ত্রী, সন্তান ও কয়েকজন স্বজনের নামে প্রায় ১১৪ একর বা ৩৪৫ বিঘা জমির সন্ধান পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সবচেয়ে বেশি জমি পাওয়া গেছে তাঁর স্ত্রী জীশান মীর্জার নামে। বেনজীরের সম্পদ জব্দ করার জন্য দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের আদেশে জমির এই হিসাব পাওয়া গেছে। আদালতে পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) উল্লেখ করেন, বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে নিজ নামে এবং স্ত্রী-সন্তানদের নামে দেশে-বিদেশে শত শত কোটি টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ করা হয়েছে। তাঁরা এই সম্পদ (তফসিলে বর্ণিত) অবৈধভাবে অর্জন করেছেন। (সূত্র: প্রথম আলো, ২৭ মে, ২০২৪)

ঘটনা ৩

২০২৪ সালের ঈদুল আযহায় সবচেয়ে আলোচিত ছাগলকাণ্ড ইস্যুতে উঠে এসেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সদ্য সাবেক সদস্য মতিউর রহমানের দুর্নীতি। আলোচিত এই কর্মকর্তা ও তাঁর স্বজনদের নামে থাকা এখন পর্যন্ত ৬৫ বিঘা (২ হাজার ১৪৫ শতাংশ) জমি, ৮টি ফ্ল্যাট, ২টি রিসোর্ট ও পিকনিক স্পট এবং ২টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের তথ্য পাওয়া গেছে। অস্বাভাবিক অর্থসম্পদ এবং এর উৎসসংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগে পঞ্চমবারের মতো সাবেক রাজস্ব কর্মকর্তা মতিউর রহমানের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। উল্লেখ্য, এর আগে চারবার এই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পায় দুদক। (সূত্র: প্রথম আলো, ২৪ জুন, ২০২৪)

ঘটনা ৪

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আরেক কর্মকর্তা কাজী আবু মাহমুদ ফয়সাল ও তার পরিবারের স্থাবর সম্পত্তি ও ব্যাংক হিসাবও জব্দের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তিনি আয়কর বিভাগের প্রথম সচিব (ট্যাক্সেস লিগ্যাল অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট) হিসেবে কর্মরত। দুদকের আইনজীবী খুরশিদ আলম খান বিবিসিকে জানিয়েছেন, কাজী আবু মাহমুদ ফয়সালের স্থাবর সম্পত্তি ও ব্যাংক হিসাব মিলিয়ে ১৬ কোটি টাকা ক্রোকের আওতায় আসবে। তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ হাজার কোটি টাকার। দুদকের তদন্তকারী দল এ পর্যন্ত ঢাকায় তার ফ্ল্যাট, দুটি প্লট, সঞ্চয়পত্রসহ ১৬ কোটি টাকার সম্পদের খোঁজ পেয়েছে। দুদক জানায়, দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত আয়ের উৎস গোপনের জন্য নিজের পাশাপাশি আত্মীয়-স্বজনের নামে ৭০০টির বেশি ব্যাংক হিসাব খোলেন এই এনবিআর কর্মকর্তা। (সূত্র: বিবিসি, ২৭ জুন, ২০২৪)

ঘটনা ৫

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়ার সম্পদের অনুসন্ধান করতে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের এক আইনজীবী। দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায়, এই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার স্ত্রীর নামে ঢাকায় একটি বাড়ি ও দুটি ফ্ল্যাট, ছেলেমেয়ের নামে ফ্ল্যাট ও বাড়ি রয়েছে। ঢাকা, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের নামে রয়েছে ৬৭ শতক জমি ও পরিবারের সদস্যদের নামে রয়েছে আরো ১৬৬ শতক জমি। (সূত্র: প্রথম আলো, ২০ জুন, ২০২৪)

ঘটনা ৬

২০২১ সালে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা লোপাট করে ভারত পালিয়ে যাওয়ার জন্য দেশের আর্থিক খাতে আলোচিত নাম প্রশান্ত কুমার হালদার ওরফে পি কে হালদার। তিনি একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও একটি ব্যাংকের শীর্ষ কর্মকর্তা ছিলেন। আবার ছিলেন দেশের আর্থিক খাতের শীর্ষ দখলদার ও খেলাপিদের একজন। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেন। পরে ব্যবসায় প্রশাসনের আইবিএ থেকে এমবিএ করেন। পাশাপাশি চার্টার্ড ফিন্যান্সিয়াল অ্যানালিস্ট (সিএফএ) সম্পন্ন করেন। এসব কাজে তাঁকে সব ধরনের সমর্থন ও সহায়তা দিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের একাধিক কর্মকর্তা। এই দুর্নীতি মামলার শুনানিকালে হাইকোর্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, ‘সেখানে কয়েক বছর অনেক চোর-ডাকাত বসে ছিল। ২০০২ সাল থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের যত জিএম (জেনারেল ম্যানেজার), ডিজিএম (ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার), এজিএম (অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার) ছিল, তারা ওখানে বসে বসে মধু পেত। বসে বসে মধু খেয়েছে তারা।’ (২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১, দৈনিক আমাদের সময়)।

এই যে চোর-ডাকাত, দুর্নীতিবাজদের কথা বলা হলো, যারা দেশের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে বিদেশে অর্থ-পাচার করেছে, তারা সকলেই দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোর উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা এবং সকলেই উচ্চশিক্ষিত। সম্প্রতি বিভিন্ন অনুসন্ধান ও প্রতিবেদনে উঠে আসা মাত্র কয়েকজন ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তার দুর্নীতির খবর আমরা এখানে উল্লেখ করলাম। এই অবৈধ সম্পত্তির পরিসংখ্যান যতটুকুন প্রকাশ পেয়েছে, তাতেই সাধারণ মানুষ দিশেহারা। অথচ এর বাইরে অপ্রকাশিত বাকি দুর্নীতির খবর আমরা কতটুকু জানি! সরকারি কার্যালয়গুলোতে যে দুর্নীতি হচ্ছে, দুদক সেটি স্বীকার করে গবেষণার রিপোর্টে উল্লেখ করেছে, ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত শতাধিক দুর্নীতির মামলায় প্রায় ৩৭৪ জনকে আসামি করা হয়েছে, যাদের অর্ধেকই সরকারি চাকরিজীবী। দুদকের কমিশনার মো. জহুরুল হক বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘সরকারি সেবাখাতে যে দুর্নীতি হচ্ছে, সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনেকেই যে অবৈধ সম্পদের মালিক হচ্ছেন, সেটাই বাস্তবতা’। (১ জুলাই, দৈনিক মানবকণ্ঠ)

এসব দুর্নীতিবাজ সরকারি চাকরিজীবীরা শুধু দুর্নীতি করেই ক্ষান্ত নয়, তাদের বিরুদ্ধে বিদেশে অর্থপাচারের অভিযোগ অনেক আগে থেকেই। কানাডায় অর্থপাচার করে বাংলাদেশি নাগরিকদের বাড়ি-গাড়ি কেনার বিষয়ে ২০২০ সালে তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল কালাম আব্দুল মো’মেন গণমাধ্যমকে বলেছিলেন, ‘আমাদের সচরাচর ধারণা যে, এগুলো হয়তো রাজনীতিবিদরা করেন। কিন্তু, সেখানে দেখা গেল এদের অধিক সংখ্যক সরকারি চাকরি করেন।’

এখন প্রশ্ন হলো, যে শিক্ষিত শ্রেণিটি মননে-মেধায় দেশের সেবার লক্ষ্যে সৎভাবে দায়িত্ব পালন করার কথা, তারা কেনো দুর্নীতিতে জড়িত, তাদেরকে কেন চোর-ডাকাত বলে সম্বোধন করা হচ্ছে?

কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য তো চোর-ডাকাত হওয়া নয়, বরং আলোকিত মানুষ হওয়া। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য একজন মানুষকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার পাশাপাশি তার মধ্যে মূল্যবোধ, নৈতিকতা, আদর্শ ও মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করা; এগুলোর সুষ্ঠু বিকাশ করা। আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত ঠিকই করতে পারছে এবং প্রতিবছরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো থেকে হাজার হাজার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী শিক্ষার্থী বের হচ্ছে। কিন্তু মানুষ বানাতে পারছে কি? চাকরিপ্রার্থীদের পছন্দসই চাকরি নির্বাচনে লক্ষ্য করা যায়, যে সকল চাকরিতে ঘুষ-আর্থিক সুবিধা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ বেশি সে সব চাকরিকে প্রাধান্য দেয়ার প্রবণতা

বেশি। এই চিত্র দিনকে দিন প্রবলতর হচ্ছে। অর্থাৎ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা নৈতিক ও আদর্শ মানুষ তৈরি করতে অনেকটাই ব্যর্থ। শুধু তা-ই নয়, মানুষকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তোলার ক্ষেত্রেও শিক্ষাব্যবস্থা দায় এড়িয়ে যেতে পারে না। যখন একটি ব্যবস্থায় শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই অন্যায়ের কাছে মাথা নত করে এবং সেই নীতিহীন ব্যবস্থা মেনে নেয়, তখন একমাত্র সুশিক্ষাই পারে সেই ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে। কিন্তু সমস্তরকম পরিসংখ্যান বলছে, দেশে যে হারে শিক্ষার হার বাড়ছে, শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়ছে, সে হারে দুর্নীতি কমছেই না বরং উল্টো বাড়ছে। তাই আমাদের দৃষ্টিপাত দিতে হবে এই শিক্ষাব্যবস্থার গলদ কোথায়?

এই গলদটি কোথায় তা চিহ্নিত করতে হলে আমাদের দেশে প্রচলিত ব্রিটিশদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার গোড়ায় যেতে হবে। এই শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের জন্য কিছু দেশীয় কেরানি তৈরি করা। তাদেরকে দেশপ্রেমিক করা নয়। যদি তারা দেশপ্রেম শিক্ষা দিত তাহলে সেটা ভিনদেশী শাসকদের জন্য আত্মঘাতী হত। এজন্য তারা ছাত্রদেরকে ব্রিটিশভক্ত ও ইউরোপ-অনুরাগী বানাতে চেয়েছে যেন তারা বিদেশের কুকুরকে ঠাকুর বলে পুজা করে। ইউরোপ যেমন বস্তুবাদী সভ্যতায় বিশ্বাসী, এখানেও তারা যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করল সেটাও ছাত্রদেরকে বস্তুবাদী হিসাবে গড়ে তুলল। এখানে নৈতিকতা ও দেশপ্রেমের মূল্যবোধ শিক্ষা দেওয়া হল না। ফলে এখান থেকে যারা শিক্ষিত হচ্ছে তারা পাশ্চাত্যপ্রেম অন্ধ, তারা নিজেদের দেশ ও জাতি সম্পর্কে হীনম্মন্যতায় নিমজ্জিত এবং তারা এখান থেকে কোনো নৈতিক চরিত্র নিয়ে বের হচ্ছে না। তাদের কাছে বস্তু অর্থাৎ জাগতিক ভোগ বিলাস, আয়-রোজগারেই প্রাধান্য। তাদের লেখাপড়ার উদ্দেশ্য গাড়িঘোড়ায় চড়ার চাইতে বেশি কিছু নয়।

মানুষের ভোগের চাহিদা অসীম। তাই যত উচ্চ বেতনই দেওয়া হোক না কেন, তারা আরো বেশি উপার্জন করতে চায়। এজন্য তারা অধিকাংশই বিভিন্ন দুর্নীতি-অনিয়ম-অন্যায়ের সাথে আপোষ করে চলছে। ধর্ম সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান ও ধারণা না থাকায় তাদের পরকালের বিশ্বাসটাও শিথিল। পরকালে তাদেরকে আল্লাহর জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে এমন চিন্তা তাদেরকে অন্যায় থেকে বিরত রাখতে পারছে না।

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যের দেশগুলোর শিক্ষাব্যবস্থায় দেশপ্রেম, নৈতিকতা গুরুত্বের সাথে রাখা হয়েছে। ফলে সে সকল রাষ্ট্রগুলোর শিক্ষিত শ্রেণিটি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্রে সততা-নৈতিকতা-দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়। সেখানে দুর্নীতি-অনিয়মের পরিসংখ্যানও নগণ্য। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তারা একজন সচেতন ও সুনাগরিকের পরিচয় দেয়। সেটা হতে পারে ট্রাফিক আইন থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্র। সেখানে একজন মাতালকে দিয়েও দেশের ক্ষতি হয় এমন কাজ করানো যায় না।

তাই যদি আমরা দেশকে বারবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়নের লজ্জা থেকে রক্ষা করতে চাই, আমাদের শিক্ষিত শ্রেণিটিকে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে তৈরি করতে চাই, দেশ ও দেশের মানুষকে দুর্নীতি ও অর্থপাচারের হাত থেকে রক্ষা করতে চাই, তবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর বিকল্প নেই।

আমাদের অবস্থা এবং আজকের প্রয়োজন

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ২৩ বছর এবং ১৯৭১ এ স্বাধীনতার পর ৪৩ বছর একটা জাতির জীবনে খুব একটা লম্বা সময়। বিশেষ করে বর্তমান পৃথিবীর এই দ্রুত জীবন গতির পরিপ্রেক্ষিতে হাজার বছর আগে একটা জাতির জীবনে পাঁচ শ' বছরে যে পরিবর্তন আসতো, আজ তা প্রায় পঁচিশ বছরেই এসে যাচ্ছে। তাই বাংলাদেশের তেতাল্লিশ বছর বয়স খুব কম নয়। এই তেতাল্লিশ বছর আমাদের কী দিয়েছে? আজ নতুন করে আমাদের পথ নির্ধারণের সময় এসেছে। তাই পেছনে চেয়ে দেখতেই হবে কোন্ পথে এখানে এসেছি আর যে পথে চলে এসেছি তার ফলাফল কী হয়েছে! নতুন পথে চলার আগে যদি পেছনের হিসাব না নেই, তবে চলার পথে আবার ভুল হতে বাধ্য। গত তেতাল্লিশ বছর আমরা ইউরোপ আমেরিকার বস্তুতান্ত্রিক অগ্রগতির মোহে তাদের পেছনে দৌঁড়েছি। জাতির আত্মার বিনিময়ে আর গরীব জনসাধারণকে আরও দারিদ্র্যের মুখে ঠেলে দেওয়ার মূল্য দিয়ে পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতার অনুকরণের চেষ্টা করেছি। ফলে দেশের মানুষের আত্মা কলুষিত করে গরীবের শোষণের মাধ্যমে যা কিছু অর্জিত হয়েছে, তা সীমাবদ্ধ হয়েছে মাত্র অল্পসংখ্যক লোকের হাতে। রাজনীতির বেলায়ও ঐ একই কথা। আমাদের এককালের প্রভু ব্রিটিশের রাজনৈতিক দর্শনকে হীনমন্যতা বশত (Inferiority complex) অনুকরণের ব্যর্থ প্রয়াস হয়েছে। দেখা দিয়েছে চরিত্রহীন ও অপরিণামদর্শী, স্বার্থকেন্দ্রিক দলাদলি, হীন পন্থায় সরকার বদলাবদলি আর গদির কোন্দল। শিক্ষাক্ষেত্রের অবস্থা আজ তেতাল্লিশ বছর পরে আরও শোচনীয়। স্বাধীনতার আগে যে শিক্ষানীতি এদেশে প্রচলিত ছিল, তা ছিল সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের তৈরি করা। তাদের নিজেদের দেশের জন্য নয়- বিশেষ করে ভারতবর্ষের জন্য। কারণ তারা দেখতে পেয়েছিলো যে, এই বিরাট দেশকে ঠিকভাবে শাসন করতে যে লোকসংখ্যার প্রয়োজন, তা বিলেত থেকে আমদানি করা সম্ভব নয়। অথচ এদেশের মানুষকেও সত্যিকার শিক্ষিত করে তোলা বিবেচনার কাজ হবে না- তাহলে বিপদ হতে পারে। তাই তীক্ষèবুদ্ধির ব্রিটিশ জাতি ভারতের জন্য এমন একটা শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি করল যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে। অর্থাৎ ভারতবাসীকে ইংরেজি অংক, ভূগোল, বিজ্ঞান কিছু বিকৃত ইতিহাস শিক্ষা দিলো- কিন্তু সাবধান রইলো কোন শত্রু যেন সৃষ্টি না হয়। আমি বলবো তাদের সে চেষ্টা সফল হয়েছিল। ব্যতিক্রম তো ব্যতিক্রমই বটে, সাধারণ নিয়ম নয় আদৌ।

যাই হোক, দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের নেতাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য ছিলো পরাধীন শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন এমন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যা একটা স্বাধীন জাতির জন্য প্রযোজ্য; যা দেশের ভবিষৎ নাগরিকদের শিক্ষিত করবে, মানুষ করবে। কিন্তু নেতারা ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থে গদী নিয়ে এমন মারামারি কাটাকাটিতে ব্যস্ত রইলেন যে, তা করা আজও হয়নি। আজ কি অবস্থা? শিক্ষা মানে লেখাপড়া নয়। আমি শিক্ষার কথা বলছি- শিক্ষার যেটি অন্যতম প্রধান দান-বিনয়, নম্রতা, ভদ্র ব্যবহার ইত্যাদির কথা ছেড়েই দিলাম, শুধু লেখাপড়ার কথাই ধরুন। এর মানও যে অবিশ্বাস্যভাবে নিচে নেমে গেছে, এ কথায় আমার সাথে একমত হবেন না এমন লোক আছেন কিনা জানি না। অন্ততঃ আমার সাথে তার দেখা হয়নি। বাস্তবতা হচ্ছে স্বাধীনতার পরবর্তী আটত্রিশ বছরে ৮০ জন ছাত্র খুন হয়েছে শুধুমাত্র প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে, আরও ২৩ জন খুন হয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। হাজার হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা লাঞ্ছিত, অপমানিত, মারধর এমনকি খুনও হয়েছেন। আর বন্দুকযুদ্ধ ছুরি মারামারি, আহত করার সংখ্যার তো কোন সীমা পরিসীমা নেই, সঠিক কোন পরিসংখ্যানও নেই। এই হচ্ছে ঘৃণ্য রাজনীতির ফল। পাশাপাশি অন্যান্য অপরাধ প্রতিদিন বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। ২০০ বছরের ব্রিটিশ আমল, ২৪ বছরের পাকিস্তানি আমল এবং ৪৩ বছরে স্বাধীন বাংলাদেশের আমলের

মধ্যে সংঘটিত অপরাধ যেমন খুন, হত্যা, রাহাজানি, দুর্নীতি, গুম ইত্যাদির মধ্যে তুলনামূলক পরিসংখ্যান বিবেচনায় নিলে কাউকে বলে দিতে হবে না যে, কি পরিমাণ অধঃপতন আমাদের হয়েছে।

আর্থিক দিক দিয়ে কী অবস্থা দাঁড়িয়েছে? যে ব্রিটিশ জাতি দু'শতাব্দী ধরে আমাদের শাসন করল, তারা যাবার সময় তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে তাদের পূঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও আমাদের নেতাদের হাতে তুলে দিয়ে গেল। নেতারা নির্বিচারে সেই ব্যবস্থাই চালু রাখলেন- এমন কি কোন রদ-বদল পর্যন্ত করলেন না। একটি পরাধীন জাতিকে শোষণ করে তার জনসাধারণকে অন্তঃসারশূন্য করে ফেলাই ছিলো যে অর্থনেতিক কাঠামোর উদ্দেশ্য, সেটাই চালু রইলো একটা স্বাধীন দেশের অর্থ ব্যবস্থা হিসাবে। মোট কথা- আমরা স্বাধীন হলাম, পাকিস্তান পেলাম পরে বাংলাদেশ পেলাম, অর্থাৎ আমাদের বিদেশি শাসক চলে গেল, কিন্তু রেখে গেল তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা- নৈতিক এবং মানসিক গোলামী যার জের আমরা আজও টেনে চলেছি দারিদ্র্য ও দুঃখ দুর্দশার অন্তহীন আবর্তে। এখন প্রশ্ন হলো এমন কেন হলো? আমাদের নেতারা এমন নির্বিচারে বিদেশি সমাজব্যবস্থা কেমন করে মেনে নিয়ে তা দেশের ওপর চাপিয়ে দিলেন? এ প্রশ্ন নিয়ে লম্বা আলোচনা এ ছোট নিবন্ধে সম্ভব নয়। কিন্তু অল্প কথায় শুধু এইটুকু এখানে বলব যে, দীর্ঘদিন পরাধীনতা এবং গোলামী শিক্ষার অন্যতম ফলস্বরূপ আমরা গভীর হীনমন্যতায় (Inferiority complex) ভুগছি। পাশ্চাত্য সভ্যতার সব কিছুই আমাদের কাছে চরম ভাল মনে হচ্ছে। তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থাই সর্বশ্রেষ্ঠ, তাদের অর্থনৈতিক সমাধানের ওপর আর কোন সমাধানই নেই, মোট কথা তারাই সব, তারাই শ্রেষ্ঠ। আমরা জন্মেছি তাদেরই অন্ধ অনুসরণ করার জন্য। আমাদের কোন জীবনাদর্শ নেই, কোন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক ব্যবস্থা নেই। কিছুই নেই। আমাদের বড় বড় নেতারা মাঝারি মাঝারি নেতারা ছোট ছোট নেতারা আর তাদের অনুসারীরা কেউ আমেরিকা, ব্রিটেনের পূঁজিবাদ আর গণতন্ত্রের পূজারী, কেউ জার্মানি ইহুদি কার্ল মার্কসের সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজমের পূজারী আর কেউ ঐগুলোরই আরও বিকৃতরূপ চীনা কমিউনিজমের পূজারী। এই হল তেতাল্লিশ বছরের হীনমন্যতার বিকৃত মনোবৃত্তির কুফল। ব্রিটিশের দেয়া পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে পাকিস্তান আমলে দেখা দিলো সামরিক শাসন। সামরিক শাসক আইয়ুব খানের শাসন শেষ হবার পর আমাদের আবার এক সম্ভাবনা আল্লাহ দিয়েছিলেন নতুন করে পথ বেছে নেবার। আমরা আবার ভুল করি। এবং সে ভুল শোধরাবার সময়ও আর কখনো পাইনি। আমাদের মধ্যে আজ পর্যন্ত সেই ভুলকে কাটিয়ে উঠার মতো ধী-শক্তির উত্থান ঘটেনি। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা আজ মোটামুটি তিনটি ভাগে বিভক্ত। কয়েকটি দল পশ্চিমা গণতন্ত্র এবং ব্রিটিশ-আমেরিকা তথা পশ্চিমাদের অনুকরণে পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে বিশ্বাসী। কয়েকটি দল সমাজতন্ত্র এবং রাশিয়া ও চীনা কমিউনিজমকে সর্বব্যাধির মহৌষধ মনে করেন। তৃতীয় দল ইসলামী সমাজ এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ মনে করেন। এই দলগুলোর আবার বেশ কয়েকটি উপদলও আছে। এখন আমরা দেশের সাধারণ মানুষরা কি করব? এদের প্রত্যেকটি দল উপদলের ভিত্তি কি সেটা ভাল করে যাচাই করে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে। নইলে আবারো মারাত্মক ভুল হবে।

আগে যে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতামতের কথা বোললাম, এদের প্রথম দু'টি ভাগ অর্থাৎ গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এই দু'টিই হীনমন্যতার দরুণ বিদেশ থেকে আমদানি করা আদর্শ। মানুষ পরের জিনিস গ্রহণ করে কখন? যখন সে মনে করে তার নিজের কিছু নেই বা থাকলেও পরেরটার চেয়ে অনেক খারাপ শুধু তখনই মানুষ পরেরটা গ্রহণ করে ভিক্ষা মাগে। দু'শো বছর শাসন করে ব্রিটিশ তার শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের মনে বসিয়ে দিয়ে গেল যে আমাদের কোন জীবনব্যবস্থা নেই কিংবা থাকলেও এত নিকৃষ্ট যে তা গ্রহণযোগ্য নয়। এই

হীনমন্যতা থেকে আমাদের নেতারাও বাদ ছিলেন না। কারণ তারাও ঐ শিক্ষাই পেয়েছিলেন তাই পাকিস্তান হবার পর তাদের শেখানো সেই বস্তুবাদী পশ্চিমা ব্যবস্থাই তারা আমাদের ঘাড়ে চাপালেন। ফল কী হলো? ফল সবারই মনে আছে। একদল গদীতে বসে বিরাট বিরাট বাড়ি বানাচ্ছেন; ব্যাংকের টাকার সংখ্যার পেছনে শুন্যের পর শূন্য যোগ হচ্ছে; মিল বানাচ্ছেন; ফ্যাক্টরি বসাচ্ছেন। ঐ সবই হচ্ছে ঐ ক্ষেতে কাজ করা গরীব কৃষকের শ্রম, খেটে খাওয়া মানুষের ঘামের ফল। তারা এত ব্যস্ত যে, ঐ গরীব কৃষকের জন্য চিন্তা ভাবনা করার সময় তাদের নেই। পশ্চিমা বস্তুবাদী গণতন্ত্রে একজন প্রধানমন্ত্রীর দৈনিক চব্বিশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে যদি ঘুম, খাওয়া ইত্যাদির জন্য আট ঘণ্টা বাদ দেন, তবে থাকে ষোল ঘণ্টা। এই ষোল ঘণ্টার মধ্যে তার নিজেকে ঐ গদীতে টিকিয়ে রাখার জন্য ব্যয় করতে হয় অন্ততঃ দশ থেকে বার ঘণ্টা। খুব বেশি হলে তিনি চার পাঁচ ঘণ্টা সময় পান ঠিকভাবে দেশের কাজ করার জন্য। প্রতি ঘণ্টায় তার কাছে দলের মেম্বাররা আসছেন- কারোর পারমিট চাই, কারোর মিল বসাবার লাইসেন্স চাই, কারোর আমদানি লাইসেন্স চাই, কারোর শালার চাকরি চাই। এদের সবাইকে খুশি করতে হবে- নইলে তিনি বিরোধী দলে চলে যাবেন। তার মানে, প্রধানমন্ত্রীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা শেষ- তার মন্ত্রিত্বও শেষ। আর বিরোধী দল তো বেঁচেই আছে সরকারের সকল কাজের বিরোধিতা করার জন্য, অস্থির করার জন্য, গদি থেকে টেনে নামানোর জন্য। কাজেই নিজেকে মন্ত্রিত্বের গদীতে শুধু টিকিয়ে রাখার জন্যই তার সমস্ত সময় ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। আমাদের কাজ করবার তার সময় কোথায়? এই জন্যই বহু প্রতিশ্রুত একুশ দফা এবং আরও অনেক দফা কার্যকরী করা যায়নি -এই জন্যই দুর্নীতি দমন করা যায় নি। আসল কথা কী? আসল কথা বুঝতে হলে আমাদের একটু পেছনে থেকে চিন্তা করে আসতে হবে। বিদেশি শাসকের বিকৃত শিক্ষার বিষময় ফল যে গভীর হীনমন্যতা আমাদের মন ও মগজে ঢুকেছে, বিশেষ করে আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে তা থেকে খানিকক্ষণের জন্য মনকে মুক্ত করতে না পারলে আমার কথা বোঝাতে পারব না। প্রথমে প্রশ্ন হচ্ছে- আল্লাহ আছেন কি না? যদি বলেন- নেই, তাহলে আর কোন কথা নেই কারণ আমার যা কিছু বলার, তা সমস্তই আল্লাহকে ভিত্তি করে। অবশ্য আপনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আল্লাহ আছেন। গুটিকতক নাস্তিক ছাড়া সবাই বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ আছেন। আর তাদের কাছেই আমার বক্তব্য। দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো- আল্লাহ সর্বজ্ঞানী এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ (Perfect) কিনা? স্বভাবতঃই এর জবাব হচ্ছে- নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞানী এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। কারণ যিনি নিখুঁত ও সম্পূর্ণ নন, তিনি আল্লাহ হবার উপযুক্ত নন। মানুষকে সৃষ্টি করার পর পৃথিবীতে সে কেমন করে তার জীবন পরিচালনা করবে, তা যদি আল্লাহ অল্পবুদ্ধি মানুষকে না শিখিয়ে থাকেন- তার চলার পথ যদি তাকে না দেখিয়ে থাকেন, তবে মানুষের প্রতি তিনি ন্যায় বিচার করেন নি। সৃষ্টি করে তাকে অসহায় অবস্থায় পৃথিবীতে ছেড়ে দিয়েছেন যা ইচ্ছা তাই করার জন্য যেমন ইচ্ছা জীবনব্যবস্থা তৈরি করা, মারামারি করা, মহাযুদ্ধ করা- কোন কিছুতেই তাহলে তার বাধা নেই এবং সেজন্য তাকে কোন কৈফিয়ৎ ও দিতে হবে না। কিন্তু তাই কী হয়েছে? আল্লাহ কি তার সৃষ্ট মানুষের প্রতি ন্যায়বিচার করেন নি? আমরা জানি, তিনি মানুষকে অনিশ্চয়তার মাঝে অসহায়ভাবে ছেড়ে দেন নি। সৃষ্টির সর্বপ্রথম মানুষ আদম (আ:)-কেই তিনি নবী করে পাঠিয়েছেন তাকে এক সুনির্দিষ্ট জীবনবিধান দান করে। এমনি করে আল্লাহ যুগে যুগে তাঁর প্রেরিত পুরুষ বা রাসুল পাঠিয়ে মানুষকে জীবনপথ জানিয়ে দিয়েছেন। এইভাবে চলে এসেছে লক্ষ লক্ষ বছর। গভীরভাবে চিন্তা করলে আমাদের সামনে কয়েকটি সত্য ভেসে ওঠে। প্রেরিত পুরুষ আল্লাহর মনোনীত পথ নিয়ে এসে মানুষকে বলেছেন তা গ্রহণ করতে। মানুষ তা গ্রহণ করেছে এবং তার ফলে তাদের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত জীবন সুখে-স্বাচ্ছন্দে ভরে উঠেছে। কিন্তু তারপর কী হয়েছে? দু'চারশ' বছর পরই মানুষের ভেতরকার শয়তান মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। অহংকার, লোভ, হিংসা, যশ এবং নেতৃত্বের মোহের বশবর্তী হয়ে তারা আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধানের বিকৃতি সাধন করেছে

একং সবচেয়ে ক্ষতিকর যেটা করেছে, তা হচ্ছে ঐ জীবন-পথের ভেতরকার আসল মর্ম ভুলে গিয়ে শুধু বাহ্যিক অনুষ্ঠান বা কঙ্কালটা নিয়ে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এমনকি তারা আল্লাহ্র দেয়া গ্রন্থে নিজেদের স্বার্থপ্রণোদিত মতামত ঢুকিয়ে বা বাদ দিয়ে তার বিকৃতি ঘটিয়েছে (যেমন ইহুদিদের তওরাত, খ্রিস্টানদের বাইবেল)। এর অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে দেখা দিয়েছে আবার অন্যায়, অশান্তি আর রক্তপাত। তখন আবার আল্লাহ লোক পাঠিয়েছেন। তিনি এসে বলেছেন- তোমরা আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা ভুলে গেছ, বিকৃত করেছ- সত্য ছেড়ে দিয়ে মিথ্যা নিয়ে মারামারি করছ। এমনি করে যুগে যুগে আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা মানুষের কাছে এসেছে। নিয়ে এসেছে শান্তি, ন্যায়, সুখ ও সমৃদ্ধি। এই জীবনব্যবস্থা বা জীবনপথ কখনও এসেছে একটা জাতির জন্য, কখনও একটা সম্প্রদায়ের জন্য, কখনও একটা গোষ্ঠীর জন্য। সে সব জীবনব্যবস্থার রূপগুলো নির্ভর করেছে সেই সেই জাতি, গোষ্ঠী বা পরিবারের, অবস্থার ওপর, পারিপার্শ্বিকতার ওপর। ইধংরং অর্থাৎ বুনিয়াদ একই থেকেছে কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় আদেশ- নির্দেশগুলো ঠিক সেই সময়ের সেই অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আল্লাহ দান করেছেন। সমস্ত মানবজাতির জন্য তা কখনও আসেনি। সমস্ত মানবজাতির জন্য জীবনব্যবস্থা এল সর্বশেষে প্রেরিত পুরুষ বিশ্বনবী মোহাম্মদের (দ:) মাধ্যমে। সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহ সর্বোত্তম জীবনব্যবস্থা দিয়ে পাঠালেন শ্রেষ্ঠ মানবকে।

শেষ নবী মোহাম্মদের (দ:) মাধ্যমে যে শেষ জীবনবিধান স্রষ্টা প্রেরণ করেছিলেন তা মানবজাতির একাংশ গ্রহণ ও সমষ্টিগত জীবনে কার্যকরী করার ফলে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি অংশ অর্থাৎ নিরাপত্তা ও অর্থনীতিতে কী ফল হয়েছিল তা ইতিহাস। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পূর্ণ নিরাপত্তা যাকে বলে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রতিটি মানুষ স্বচ্ছল হয়ে গিয়েছিল। মানবরচিত কোন জীবনব্যবস্থাই এর একটি ভগ্নাংশও মানবজাতিকে উপহার দিতে পারে নাই। এই অকল্পনীয় শান্তিময় অবস্থা কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল? এর একমাত্র কারণ, মানুষ মানবরচিত সকলব্যবস্থা, বিধান প্রত্যাখ্যান করে তার স্রষ্টার দেওয়া জীবনব্যবস্থা গ্রহণ এবং জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে সামগ্রিকভাবে প্রয়োগ করেছিল অর্থাৎ 'লা-ইলাহা এল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া আর কারও বিধান গ্রহণ করি না' এই মূলমন্ত্রের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করেছিল।

এখানে আমি যে জীবনব্যবস্থা (দীন) প্রতিষ্ঠার কথা বলছি আর বর্তমানে ইসলাম বলে যে ধর্মটি চালু আছে এই দু'টি এক জিনিস নয়। আমি সেই প্রকৃত ইসলামের কথা বলছি যা আল্লাহ তাঁর রাসুলের মাধ্যমে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, যে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে অর্ধ্ব-পৃথিবীর মানুষকে অতুলনীয় শান্তি ও নিরাপত্তার স্বর্ণযুগ উপহার দিয়েছিলো। সেই প্রকৃত ইসলাম গত ১৩০০ বছরের কালপরিক্রমায় বিকৃত হতে হতে বর্তমানে একেবারে বিপরীতমুখী হয়ে গেছে। তথাকথিত আলেম শ্রেণি এই বিকৃত ইসলামটিকে তাদের রুটি রুজির মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছেন। অখণ্ড উম্মতে মোহাম্মদী ফেরকা, মাযহাব, মাসলা-মাসায়েল ইত্যাদির কূটতর্ক নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি, হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে হাজারো ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে; আরেকটি অংশ ইসলামের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে মানুষকে ইসলামের বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে। জাতির বৃহত্তম অংশটি শুধুমাত্র তাদের ব্যক্তিগত জীবনে ঐ বিকৃত ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা করে যাচ্ছে। এর কোনটাই আল্লাহ, রাসুলের প্রকৃত ইসলাম নয়, কেননা ইসলাম শব্দের আক্ষরিক অর্থই শান্তি। অর্থাৎ যারা ইসলামের অনুসারী হবে তারা শান্তিতে থাকবে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা ঠিক এর বিপরীত। এই অবস্থা থেকে মানবজাতিকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহর দেওয়া সঠিক ও অবিকৃত ইসলামের দিকে ফিরে যেতে হবে। যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী সেই প্রকৃত ইসলামের রূপরেখা মানবজাতির সামনে তুলে ধরেছেন। এখন মানবজাতির জীবনকে শান্তিময় করতে হলে যে জিনিসটি

দরকার অর্থাৎ জীবনব্যবস্থা সেটি এসে গেছে। আল্লাহর শোকর, আমরা একদল মানুষ সেই জীবনব্যবস্থাকে সত্য বলে গ্রহণ করে নিয়েছি এবং অন্য সকলকে তার দিকে আহ্বান করছি। এখন একটাই প্রশ্ন মানবজাতি কি সেটা গ্রহণ করে নিজেদের আশরাফুল মাখলুকাত প্রমাণ করবে, নাকি প্রত্যাখ্যান করে আসফালা সাফিলীন অর্থাৎ সর্বনিকৃষ্ট জীব বলে প্রমাণ করবে। আল্লাহ এই জীবনব্যবস্থা মানুষের সামনে পেশ করে বলেছেন, সত্য তোমাদের সামনে উপস্থাপন করা গেল, যার ইচ্ছা সে গ্রহণ করুক, যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করুক।

মাননীয় এমামুয্যামান
জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মাননীয় এমামুয্যামান ছিলেন ঐতিহ্যবাহী পন্নী জমিদার পরিবারের সন্তান। তাঁর পরিবারের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস ইতিহাসের পাঠকমাত্রই জানেন। সুলতানী যুগে এবং মোগল আমলে এ পরিবারের পূর্বপুরুষগণ ছিলেন অত্র এলাকার শাসক। এমনকি তারা দীর্ঘকাল বাংলা সালতানাতের সুলতান ছিলেন। বাংলাদেশের ইতিহাস, শিক্ষা, সংস্কৃতির সঙ্গে এই পরিবারের কীর্তি এক সূত্রে গাঁথা। বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন সুলতান ছিলেন এমামুয্যামানেরই পূর্বপুরুষ দাউদ খান পন্নী (কররানি)। মোঘল সেনাবাহিনীর সঙ্গে রাজমহলের যুদ্ধে তিনি বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁর এই হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়েই বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়।

আমাদের এই উপমহাদেশসহ সমগ্র পৃথিবী যখন খ্রিস্টান ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের যাতাকলে নিষ্পেষিত বিশেষ করে মুসলিম বিশ্ব যখন ইহুদি-খ্রিস্টানদের হাতে চরমভাবে নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ঠিক সেই মুহূর্তে আল্লাহ এই জাতির উপর সদয় হলেন, তিনি পৃথিবীতে পাঠালেন তাঁর মনোনীত একজন মহামানব, এ যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে। মাননীয় এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী করটিয়া, টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী পন্নী পরিবারে ১৯২৫ সনের ১১ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবন শুরু হয় রোকাইয়া উচ্চ মাদ্রাসায় যার নামকরণ হয়েছিল করোটিয়ার সা'দাত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা জনাব ওয়াজেদ আলী খান পন্নী'র স্ত্রী অর্থাৎ এমামুয্যামানের দাদীর নামে। দুই বছর মাদ্রাসায় পড়ার পর তিনি ভর্তি হন

এইচ. এম. ইনস্টিটিউশনে যার নামকরণ হয়েছিল এমামুয্যামানের প্রপিতামহ হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী'র নামে। এই স্কুল থেকে তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৪২ সনে মেট্রিকুলেশন (বর্তমানে এসএসসি) পাশ করেন। এরপর সা'দাত কলেজে কিছুদিন অতিবাহিত করে ভর্তি হন বগুড়ার আজিজুল হক কলেজে। সেখানে প্রথম বর্ষ শেষ করে দ্বিতীয় বর্ষে কোলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন যা বর্ত্তমানে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কলেজ নামে পরিচিত। সেখান থেকে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক সমাপ্ত করেন।

কলকাতায় তাঁর শিক্ষালাভের সময় পুরো ভারত উপমহাদেশ ছিলো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তাল আর কলকাতা ছিলো এই বিপ্লবের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। আন্দোলনের এই চরম মুহূর্তে তরুণ এমামুয্যামান ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে পুরোপুরি জড়িয়ে পরেন। সেই সুবাদে তিনি এই সংগ্রামের কিংবদন্তীতুল্য নেতৃবৃন্দের সাহচর্য লাভ করেন যাঁদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্, অরবিন্দু বোস, শহীদ হোসেন সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী অন্যতম। উপমহাদেশের দু'টি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ দল ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব দান করেছিল যথা- মাহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং মোহম্মদ আলী জিন্নাহ'র নেতৃত্বে সর্বভারতীয় মুসলীম লীগ। কিন্তু এমামুয্যামান এই দু'টি বড় দলের একটিতেও যুক্ত না হয়ে যোগ দিলেন আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান আল মাশরেকীর প্রতিষ্ঠিত 'তেহরীক এ খাকসার' নামক আন্দোলনে। আন্দোলনটি অনন্য শৃঙ্খলা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে পুরো ভারতবর্ষব্যাপী বিস্তার লাভ করেছিল এবং ব্রিটিশ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এমামুয্যামান ছাত্র বয়সে উক্ত আন্দোলনে সাধারণ একজন সদস্য হিসেবে যোগদান করেও খুব দ্রুত তাঁর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ও পুরাতন নেতাদের ছাড়িয়ে পূর্ববাংলার কমান্ডারের দায়িত্বপদ লাভ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি দুঃসাহসী কর্মকাণ্ড ও সহজাত নেতৃত্বের গুণে আন্দোলনের কর্ণধার আল্লামা মাশরেকী'র নজরে আসেন এবং স্বয়ং আল্লামা মাশরেকী তাঁকে সমগ্র

ভারতবর্ষ থেকে বিশেষ কাজের (Special Assignment) জন্য বাছাইকৃত ৯৬ জন 'সালার-এ-খাস হিন্দ' (বিশেষ কমান্ডার, ভারত) এর একজন হিসেবে নির্বাচিত করেন। এটি ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ ত্যাগ এবং দেশ বিভাগের ঠিক আগের ঘটনা, তখন এমামুয্যামানের বয়স ছিলো মাত্র ২২ বছর। দেশ বিভাগের অল্পদিন পর তিনি বাংলাদেশে (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান) নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন।

আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান মাশরেকী 'খাকসার' আন্দোলন ভেঙ্গে দেওয়ার পর আন্দোলনের ইসলামপ্রিয় নিবেদিতপ্রাণ কর্মীরা চান আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখতে। এজন্য তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাংলাদেশে আসেন এবং করটিয়াতে এমামুয্যামানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। কিন্তু এমামুয্যামান আর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হোতে চান না। এরপর বেশ কয়েকবছর তিনি রাজনীতির সংস্রব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিরিবিলি জীবনযাপন আরম্ভ করেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর ছিল শিকারের শখ। তাই যখনই সময় সুযোগ পেতেন বেরিয়ে পড়তেন শিকারে। রায়ফেল হাতে হিংস্র পশুর খোঁজে ছুটে বেড়াতেন দেশের বিভিন্ন এলাকার বনে-জঙ্গলে। শিকারের লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা নিয়ে পরে তিনি 'বাঘ-বন-বন্দুক' নামক একটি বই লেখেন।

এভাবে এক যুগেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হবার পর এলাকাবাসীর অনুরোধে তিনি সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন।

মাননীয় এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী'র চাচাতো ভাই জনাব খুঁরম খান পন্নী ছিলেন টাঙ্গাইল-বাসাইল নির্বাচনী আসনের প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য (এমপি) যিনি ১৯৬৩ সনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হলে উক্ত আসনটি শূন্য হয়ে যায় এবং শূন্যতা পূরণের জন্য উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় এমামুয্যামান এই উপনির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে দাঁড়ান এবং আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগের প্রার্থীগণসহ বিপক্ষীয় মোট ছয়জন প্রার্থীকে বিপুল ব্যবধানে পরাজিত করে এমপি নির্বাচিত হন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সকল প্রার্থীই এত কম ভোট পান যে সকলেরই জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়।

প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য থাকা অবস্থায় তিনি 'কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন' এর সদস্যপদ লাভ করেন। এছাড়াও তিনি আরও যে সংসদীয় উপকমিটিগুলির সদস্য ছিলেন তার মধ্যে স্ট্যান্ডিং কমিটি অন পাবলিক-একাউন্ট, কমিটি অফ রুল অ্যান্ড প্রসিডিউর, কমিটি অন কনডাক্ট অফ মেম্বারস, সিলেক্ট কমিটি অন হুইপিং বিল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী নির্বাচনে তিনি নিজ নির্বাচনী এলাকা (Constituency) পরিবর্তন করা ছাড়াও আরও কয়েকটি বিশেষ কারণে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে পারেন নি। এরপর থেকে তিনি নিজেকে রাজনীতি থেকে পুরোপুরি গুটিয়ে নেন কারণ দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক অঙ্গনের নৈতিকতা বিবর্জিত পরিবেশে তিনি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না।

মাননীয় এমামুয্যামান যখন রাজনীতিতে ছিলেন তখন এই অঙ্গন আজকের মত এতটা মিথ্যাচারে পূর্ণ ছিল না। তারমধ্যেও মাননীয় এমামুয্যামান ছিলেন স্বমহিমায় উজ্জ্বল। তাঁর অসমান্য ব্যক্তিত্ব, সততা, নিষ্ঠা, ওয়াদাপূরণ, নিঃস্বার্থ জনকল্যাণ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের কারণ আইন পরিষদের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হয়েও তিনি অনেক প্রবীণ ও জ্যেষ্ঠ রাজনীতিকবৃন্দের সমীহ ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

১৯৬৩ সনে তিনি করটিয়ায় হায়দার আলী রেড ক্রস ম্যাটার্নিটি অ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হসপিটাল প্রতিষ্ঠা করেন যার দ্বারা এখনও উক্ত এলাকার বহু মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। ১৯৬৯ সনে ৪৪ বৎসর বয়সে তিনি এদেশে বসবাসরত বোম্বের কাচ্ এলাকার অধিবাসী মেমোন সম্প্রদায়ের মেয়ে মরিয়ম সাত্তারের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৯৬ সনে স্ত্রীর এন্তেকালের পর ১৯৯৯ সনে বিক্রমপুর মুন্সিগঞ্জের খাদিজা খাতুনের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন।

এমামুয্যামান ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীত সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তরুণ বয়সে তিনি উপমহাদেশের বিখ্যাত সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরুর কাছে রাগসঙ্গীতের তালিম নিয়েছেন। এই একই ওস্তাদের কাছে গান শিখেছিলেন জাতীয় কবি নজরুলও। মাননীয় এমামুয্যামান ছিলেন নজরুল একাডেমি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা এবং এর ট্রাস্টি বোর্ডের আজীবন সদস্য।

প্রকৃত ইসলামের জ্ঞান লাভ

ভেদাভেদ আর হানাহানিতে লিপ্ত অন্য জাতিগুলি দ্বারা শোষিত ও লাঞ্ছিত মুসলিম জাতি সম্পর্কে এমামুয্যামান ভাবতেন ছোট বয়স থেকেই। ছোটবেলায় যখন তিনি মুসলিম জাতির পূর্ব ইতিহাসগুলি পাঠ করেন তখন থেকেই তাঁর মনে কিছু প্রশ্ন নাড়া দিতে শুরু করে। প্রশ্নগুলি তাঁকে প্রচণ্ড দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে দেয়, তিনি এগুলির জবাব জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। তাঁর শৈশবকালে প্রায় সমগ্র মুসলিম বিশ্ব ইউরোপীয় জাতিগুলির দ্বারা সামরিকভাবে পরাজিত হয়ে তাদের অধীনতা মেনে নিয়ে জীবনযাপন করছিল। মুসলিম জাতির অতীতের সাথে বর্তমান অবস্থার এই বিরাট পার্থক্য দেখে তিনি রীতিমত সংশয়ে পড়ে যান যে এরাই কি সেই জাতি যারা সামরিক শক্তিতে, ধনবলে ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি অঙ্গনে যারা ছিল সকলের অগ্রণী? কিসের পরশে এই জাতি ১৪০০ বছর পূর্বে একটি মহান উম্মাহয় পরিণত হয়েছিল, আর কিসের অভাবে আজকে তাদের এই চরম দুর্দশা, তারা সকল জাতির দ্বারা পরাজিত, শোষিত, দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, দুনিয়ার সবচেয়ে হত-দরিদ্র ও অশিক্ষা-কুশিক্ষায় জর্জরিত, সব জাতির দ্বারা লাঞ্ছিত এবং অপমানিত?

মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে তিনি ধীরে ধীরে অনুধাবন করলেন কি সেই শুভঙ্করের ফাঁকি। ষাটের দশকে এসে তাঁর কাছে এই বিষয়টি দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে ধরা দিল। তিনি বুঝতে পারলেন কোন পরশপাথরের ছোঁয়ায় অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত আরবরা যারা পুরুষাণুক্রমে নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে মগ্ন ছিলো, যারা ছিল বিশ্বের সম্ভবত সবচেয়ে অবহেলিত জাতি, তারাই মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে এমন একটি ঐক্যবদ্ধ, সুশৃংখল, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জাতিতে রূপান্তরিত হলো যে তারা তখনকার দুনিয়ার দু'টি মহাশক্তিকে (Super power) সামরিক সংঘর্ষে পরাজিত করে ফেলল, তাও আলাদা আলাদাভাবে নয় - একই সঙ্গে দু'টিকে, এবং অর্ধ পৃথিবীতে একটি নতুন সভ্যতা অর্থাৎ দীন (যাকে বর্তমানে বিকৃত আকীদায় ধর্ম বলা হয়) প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সেই পরশপাথর হচ্ছে প্রকৃত ইসলাম যা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ রাসুল সমগ্র মানবজাতির জন্য নিয়ে এসেছিলেন। এমামুয্যামান আরও বুঝতে সক্ষম হলেন আল্লাহর রসুলের ওফাতের এক শতাব্দী পর থেকে এই দীন বিকৃত হোতে হোতে ১৩'শ বছর পর এই বিকৃতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ঐ সত্যিকার ইসলামের সাথে বর্তমানে ইসলাম হিসাবে যে ধর্মটি সর্বত্র পালিত হচ্ছে তার কোনই মিল নেই, ঐ জাতিটির সাথেও এই জাতির কোন মিল নেই। শুধু তাই নয়, বর্তমানে প্রচলিত ইসলাম সীমাহীন বিকৃতির ফলে এখন রাসুলাল্লাহর আনীত ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে। যা কিছু মিল আছে তার সবই বাহ্যিক, ধর্মীয় কিছু আচার অনুষ্ঠানের মিল, ভেতরে,

আত্মায়, চরিত্রে এই দু'টি ইসলামের মধ্যে কোনই মিল নেই, এমনকি দীনের ভিত্তি অর্থাৎ তওহীদ বা কলেমার অর্থ পর্যন্ত পাল্টে গেছে, কলেমা থেকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বই হারিয়ে গেছে, দীনের আকীদা অর্থাৎ এই দীনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণাও বদলে গেছে।

এই জাতির পতনের কারণ যখন তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন তিনি কয়েকটি বই লিখে এই মহাসত্য মানুষের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস পান। ১৯৯৫ সনে এমামুয্যামান হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের সূচনা করেন এবং মানুষকে প্রকৃত এসলামে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানাতে থাকেন। তিনি বলেন, আল্লাহ ছাড়া জগতের সকল বিধানদাতা, হুকুমদাতা, সার্বভৌম অস্তিত্বকে অস্বীকার করাই হচ্ছে তওহীদ, এটাই এই দীনের ভিত্তি। সংক্ষেপে এর মর্মার্থ হচ্ছে আমি জীবনের প্রতিটি বিষয়ে যেখানেই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কোন বক্তব্য আছে সেটা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি যে বিভাগেই হোক না কেন, সেই ব্যাপারে আমি আর কারও কোন বক্তব্য, নির্দেশ মানি না। বর্তমান দুনিয়ার কোথাও এই তওহীদ নেই, সর্বত্র আল্লাহকে কেবল উপাস্য বা মা'বুদ হিসাবে মানা হচ্ছে, কিন্তু ইলাহ বা সার্বভৌমত্বের আসনে আল্লাহ নেই। মানুষ নিজেই এখন নিজের জীবনব্যবস্থা তৈরি করে সেই মোতাবেক জীবন চালাচ্ছে। তওহীদে না থাকার কারণে এই মুসলিম নামক জনসংখ্যাসহ সমগ্র মানবজাতি কার্যত মোশরেক ও কাফের হয়ে আছে। মাননীয় এমামুয্যামান ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানবজাতিকে এই শেরক ও কুফর থেকে মুক্ত হয়ে পুনরায় সেই কলেমায় ফিরে আসার ডাক দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, আমাদের দেশসহ সমস্ত পৃথিবীব্যাপী যে অন্যায়, অবিচার, অশান্তি চলছে তার নেপথ্য কারণ হলো আল্লাহ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা বাদ দিয়ে মানবরচিত তন্ত্র-মন্ত্র গ্রহণ করা। এই তন্ত্র-মন্ত্র গ্রহণ করে আমরা শতধাবিচ্ছিন্ন, পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত দুর্বল জনসংখ্যায় পরিণত হয়েছি। এখন আমরা যদি এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে চাই তবে সকল বাদ-বিসম্বাদ ভুলে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হোতেই হবে। সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে এক জাতিতে পরিণত করার জন্যই যামানার এমামের আবির্ভাব। তিনি ভারতবর্ষে আগত আল্লাহর সকল অবতারদেরকে নবী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তাঁদের সবার প্রতি সালাম পেশ করেছেন। এজন্য তাঁকে বিকৃত ইসলামের আলেমদের বহু বিরোধিতার সম্মুখীন হোতে হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে, তাঁর বাড়িতে আক্রমণ করা হয়েছে, তাঁর বই পোড়ানো হয়েছে। কিন্তু তিনি সত্য থেকে এক চুলও নড়েননি।

তিনি ছিলেন সত্যের মূর্ত প্রতীক। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন সত্য সন্ধান এবং সত্যের জন্য লড়াই করে গেছেন। তাঁর ৮৬ বছরের জীবনে একবারের জন্যও আইনভঙ্গের কোন রেকর্ড নেই, নৈতিক স্খলনের কোন নজির নেই। আধ্যাত্মিক ও মানবিক চরিত্রে বলীয়ান এ মহামানব সারাজীবনে একটিও মিথ্যা শব্দ উচ্চারণ করেন নাই। ১৬ জানুয়ারি ২০১২ ঈসায়ী এই মহামানব প্রত্যক্ষ দুনিয়া থেকে পর্দাগ্রহণ করেন।

বিশেষ অর্জন (Achievements)

১. ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন: তিনি তেহরীক এ খাকসারের পূর্ববাংলা কমান্ডার ছিলেন এবং বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য 'সালার এ খাস হিন্দ' পদবীযুক্ত বিশেষ কমান্ডার নির্বাচিত হন।

২. চিকিৎসা: তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক। বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান, তৎকালীন ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামসহ অনেক বরেণ্য ব্যক্তি তাঁর রোগীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

৩. সাহিত্যকর্ম: বেশ কিছু আলোড়ন সৃষ্টিকারী বইয়ের রচয়িতা যার একটি ২০০৮ এর সর্বাধিক বিক্রয়কৃত বই। তাঁর বাঘ-বন-বন্দুক বইটি পাকিস্তান লেখক সংঘের (পূর্বাঞ্চল শাখা) সম্পাদক শহীদ মুনির চৌধুরীর সুপারিশে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে দ্রুতপাঠ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়াও তিনি পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে চিকিৎসা, ধর্ম ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গে প্রবন্ধ লিখেছেন।

৪. শিকার: বহু হিংস্র প্রাণী শিকার করেছেন যার মধ্যে চিতাবাঘ, বন্য শুকর, অজগর সাপ, কুমির প্রভৃতি রোয়েছে।

৫. রায়ফেল শুটিং: **১৯৫৪** সনে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তান দলের অন্যতম রায়ফেল শুটার হিসাবে নির্বাচিত হন।

৬. রাজনীতি: পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য (এমপি) নির্বাচিত হন (১৯৬৩-৬৫)।

৭. সমাজসেবা: হায়দার আলী রেডক্রস ম্যাটার্নিটি অ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হসপিটাল ও সা'দাত ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা।

৮. শিল্প সংস্কৃতি: নজরুল একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।